রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লী-চিত্র

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক
রাসবিহারী চক্রবর্ত্তী
নবজীবন পাবলিশিং হাউস,
১৯৫।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা

১৩৪৫, আষাঢ়
মূল্য বারো আনা

প্রিণ্টার—শ্রীসমরেন্দ্র ভূষণ মল্লিক
বাণী প্রেস
১৬নং হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লী-চিত্র

লেখকের অন্যান্য বই

১।	মনের খেলা	...	...	১৲
২।	অগ্রদূত	...	...	১৲
৩।	রিয়লিষ্ট রবীন্দ্রনাথ	...	...	১৲
৪।	স্বর্গের ঠিকানা	...	...	৸৹
৫।	কমিউনিজম	...	...	৸৹
৬।	মরুজয়ের সেনা	...	...	॥৹
৭।	সবহারাদের গান	...	...	॥৹
৮।	ঘরের মায়া	...	...	।৵৹
৯।	এয়ী	...	...	৵৹
১০।	অভিশাপ না আশীর্ব্বাদ	...	...	৵৹
১১।	বঙ্কিমের স্বপ্ন	...	...	৵৹
১২।	মানুষের অধিকার	...	...	।৹
১৩।	রাসিয়ার কথা	...	...	।৹
১৪।	সভ্যতার ব্যাধি	...	...	৵১০
১৫।	সাম্যবাদের মর্ম্মকথা	...	...	॥৹



২০।১।

Gowripur Lodge
Kalimpong.

কল্যাণীয়েষু,-

প্রতিদিন অন্তবিহীন চিঠি লেখালেখি, আশীর্বাণীর দাবী, অভিমতের অনুরোধ, বাংলাদেশের নবজাতদের নামকরণ, আসন্ন বিবাহের সরকারী রশুনচৌকিগিরি আমার শরীরের স্বাস্থ্য ও মনের শান্তির পক্ষে অসহ্য হয়েছে, দাবী অসঙ্গত হ'লেও আমি সহজে অস্বীকার করতে পারিনি বলেই আমার কাঁধ থেকে বোঝা নামলনা। যখন শক্তি ছিল তখন খ্যাত অখ্যাত কাউকেই বঞ্চিত করতে পারিনি, কিন্তু প্রাণোদ্যমের মিতব্যয়িতা যখন অত্যাবশ্যক হয়েছে তখন বিপন্ন অবস্থায় জনসাধারণের কাছে নিস্কৃতি চেয়ে সংবাদ পত্রে চিঠি দিয়েছি এত দিনে হয়তো ছাপা হয়ে থাকবে, এই মৌনব্রত আরম্ভ করবার পূর্বে তোমাকে এই চিঠিতে আশীর্বাদ না করে থাকতে পারলুম না। আমার পল্লীচিত্র সম্বন্ধে তোমার বই খানি পড়ে বিশেষ খুশি হয়েছি তার কারণ এ নয় যে তুমি আমাকে প্রশংসা করেছ। বাংলা পল্লী থেকে আমি যে আনন্দ পেয়েছি এবং যত আনন্দ ঢেলে দিয়েছি তার পরে, যত বিচিত্র আকারে গদ্যে পদ্যে, আর শেষ পর্য্যন্ত পল্লীবাসীদের কল্যাণ

সাধনের জন্যে যতটা চেষ্টা করেছি আর কোনো বাঙ্গালী লেখক বা রাষ্ট্রনেতার জীবনে তার কোনো লক্ষণ দেখেছি বলে আমিতো মনে করিনে। এতদিন পরে উদাসীন বাঙ্গালী পাঠকদের হয়ে আমার জীবনের অত্যন্ত সত্য অনুভূতিকে তুমি যে এমন আনন্দের ভাষায় প্রকাশ করেছ এতে আমি পুরস্কৃত হয়েছি।

ডাক যোগে তোমার প্রতি এই আমার শেষ অভিনন্দন। বিশ্রামের চেষ্টায় চল্লুম—আশাকরি চেষ্টা ব্যর্থ হবে না, বিশ্রামের আবাদে যদি ফসল ফলে তবে পছন্দ হলে তোমা-দেরি ঘরে তুলতে পারবে। ইতি—১৬, ৬, ৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা

'রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লী-চিত্র' ইতিপূর্ব্বে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে 'দেশ'-এর পাতায়। সেই ছড়ানো প্রবন্ধগুলি এতদিন পরে বই হ'য়ে বেরুলো। পুস্তকের শেষ প্রবন্ধটীর মধ্যে পল্লীর কোনো পরিচয় নেই, তবুও সেটীকে অন্যান্য প্রবন্ধের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হ'য়েছে। এর একটী কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা উঠলে এমন কথা আজও শুনতে পাওয়া যায়—তিনি শহরের বিলাসী কবি, নগরের অভিজাতসম্প্রদায়ের কৃত্রিম জীবনের সঙ্গেই তাঁর লেখনীর কারবার। এই ধারণা ভুল। কতখানি ভুল, তারই পরিচয় দেবার জন্য একদা লেখা হয়েছিল এই প্রবন্ধগুলি। পল্লীর প্রকৃতি আর পল্লীর মানুষের প্রতি যে বিপুল দরদ প্রকাশ পেয়েছে কবির অসংখ্য গল্পে, প্রবন্ধে ও কবিতায়—তার মধ্যে ফুটে উঠেছে একটি বিশাল সত্য। এই সত্যটী হোলো, দুনিয়ায় যারা অনাদৃত আর শৃঙ্খলিত তাদের প্রতি তাঁর অন্তহীন সমবেদনা। রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লী-চিত্রের শেষের প্রবন্ধটী এই সত্যকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে। সেই জন্যই সেটীকে স্থান দেওয়া হয়েছে এই পুস্তকখানির মধ্যে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লী-চিত্র

(১)

ইংরেজদের কাছে যেমন সেক্‌স্‌পীয়ার, জার্ম্মানদের কাছে যেমন গ্যেটে, আমেরিকানদের কাছে যেমন হুইটম্যান, ইটালিয়ানদের কাছে যেমন দান্তে, বাঙালীর কাছে তেমনি রবীন্দ্রনাথ। তিনি আমাদের জাতীয় কবি। তিনি হিন্দুর, তিনি মুসলমানের; তিনি ব্রাহ্মের, তিনি খৃষ্টানের; তিনি বর্ত্তমানের, তিনি ভবিষ্যতের; তিনি নারীর, তিনি পুরুষের; তিনি নবীনের, তিনি প্রবীনের; তিনি বালকের, তিনি বৃদ্ধের। যেখানে বাঙালী আছে এবং বাঙালীর সাহিত্য আছে, গৌরবের অভ্রভেদী শিখরে সেখানে রবীন্দ্রনাথও আছেন। তিনি আছেন আমাদের উৎসবে, তিনি আছেন আমাদের শোকে; তিনি আছেন আমাদের বিরহে, তিনি আছেন আমাদের মিলনে; তিনি আছেন আমাদের কৈশোরের স্বপ্নে, তিনি আছেন আমাদের যৌবনের উন্মাদনায়; আমাদের দুর্ব্বল-মুহূর্ত্তে শক্তির

তিনি উৎস, আমাদের কণ্টকাকীর্ণ চলার পথে তিনি অফুরন্ত প্রেরণা ; আমাদের অন্ধকারে তিনি আলো, আমাদের অবসাদে তিনি আশা ; তাঁর কণ্ঠে আমাদের অকথিত বাণী, তাঁর সঙ্গীতে আমাদের প্রাণের স্পন্দন ; আমাদের হাসিতে, আমাদের অশ্রুতে, আমাদের প্রেমে, আমাদের ঘৃণায়, আমাদের বিস্ময়ে, আমাদের আকাঙ্ক্ষায়, আমাদের রক্তের কণায় কণায় তাঁর বাঁশির সুর।

এমন ক'রে আমাদের হৃদয়কে তিনি অধিকার করতে পেরেছেন—কারণ বাংলার হাট, বাংলার মাঠ, বাংলার আকাশ, বাংলার বাতাস, বাংলার নদী, বাংলার বন, বাংলার আশা, বাংলার ভাষা—সব কিছুকেই তিনি সাদরে গ্রহণ করেছেন তাঁর অন্তরের অন্তঃপুরে। শীতল ছায়া, আমকাঁঠালের বন, পুকুরের পাড়, কোকিলের ডাক, আম্রমুকুলের সৌগন্ধ, পাখী-ডাকা পল্লীপথ, অঘ্রাণের ভরা ক্ষেত, পারে যাবার খেয়াঘাট, পল্লব-ঘন আম্রকানন, বেণু-বনের ঝিলিমিলি, চখাচখীর কাকলী-কল্লোল—এরি মধ্যে বিরহ-মিলন, হাসি-কান্না নিয়ে শান্ত বাঙালীর যে জীবনস্রোত প্রবাহিত হ'চ্ছে, তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় অতিশয় নিবিড়। এই পরিচয়ের নিবিড়তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বহু কবিতায়, বহু গল্পে, বহু রচনায়। তাঁর লেখার মধ্যে বাংলাদেশের মাটির খাঁটি সুরটীকে আমরা শুনতে পাই ব'লে আমাদের তিনি এত প্রিয়। যে কারণে আমাদের কানে দোয়েল, কোকিল আর 'বউ-কথা-কও'এর গান এত ভাল লাগে, যে কারণে কীর্ত্তন আর বাউলের সুর শুনলে আমাদের রক্তে

পুলক জাগে, যে কারণে শিউলি ফুলের গন্ধ, পলাশের রক্তিমা, কাশ ফুলের হাসি আমাদের প্রাণকে এত খুসি করে—ঠিক সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রতি আমাদের আকর্ষণ এতখানি তীব্র। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে লিখিত ছিন্নপত্রের একখানি চিঠিতে আছে, "বঙ্কিমবাবু ঊনবিংশ শতাব্দীর পোষ্যপুত্র আধুনিক বাঙালীর কথা যেখানে ব'লেছেন, সেখানে কৃতকার্য্য হয়েছেন, কিন্তু যেখানে পুরাতন বাঙালীর কথা বলতে গিয়েছেন সেখানে তাঁকে অনেক বানাতে হয়েছে; চন্দ্রশেখর, প্রতাপ প্রভৃতি কতকগুলি বড় বড় মানুষ এঁকেছেন (অর্থাৎ তাঁরা সকল দেশীয় সকল জাতীয় লোক হ'তে পারতেন, তাঁদের মধ্যে জাতির এবং দেশ-কালের বিশেষ চিহ্ন নেই) কিন্তু বাঙালী আঁকতে পারেন নি। আমাদের এই চির-পীড়িত, ধৈর্য্যশীল, স্বজনবৎসল, বাস্তু-ভিটাবলম্বী প্রচণ্ডকর্ম্মশীল-পৃথিবীর এক নিভৃতপ্রান্তবাসী শান্ত বাঙালীর কাহিনী কেউ ভালো ক'রে বলে নি।" এই শান্ত বাঙালীর কাহিনী রবীন্দ্রনাথই প্রথম ভালো ক'রে আঁকলেন আমাদের সাহিত্যে। তাঁর লেখার মধ্যে আমরা সর্ব্বপ্রথম দেখতে পেলাম সেই চিরদিনের বাঙলাকে, যেখানে নদীর ঢালু তটে চাষী চাষ করে, ওপারের জনশূন্য তৃণশূন্য বালুতীরতলে হাঁস উড়ে চলে, যেখানে চোখে জাগে নারকেল পাতার ঝুর্‌ঝুর্ কাঁপুনি, নাকে আসে প্রস্ফুটিত সর্ষেক্ষেতের গন্ধ, কানে শোনা যায় ঘাটের মেয়েদের উচ্চহাসি, মিষ্টকণ্ঠস্বর। ঘুঘু ডাকছে এবং মাঝে মাঝে গরুর গলার হাম্বারব শোনা যাচ্ছে, কাঠবিড়ালী একবার ল্যাজের উপর ভর দিয়ে ব'সে

মাথা তুলে চকিতের মধ্যে অদৃশ্য হচ্ছে, ছোটো ছোটো ধানের গাছগুলা বাতাসে ক্রমাগত কাঁপছে, পাতিহাঁস জলের মধ্যে নেবে ক্রমাগত মাথা ডুবাচ্ছে এবং চঞ্চু দিয়ে পিঠের পালক সাফ করছে, বটগাছের তলায় নানাবিধ লোক জড়ো হ'য়ে খেয়া-নৌকার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, বাতাস প্রকৃতির স্নেহ-হস্তের মত আস্তে আস্তে চুলের মধ্যে আঙ্গুল বুলিয়ে দিচ্ছে, জল ছল্ ছল্ শব্দ ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে, নদীর তুইধারে মেয়েরা স্নান করচে, কাপড় কাচচে এবং ভিজে কাপড়ে এক মাথা ঘোমটা টেনে জলের কলসী নিয়ে ডান হাত তুলিয়ে ঘরে চলেছে, জেলেদের জাল থেকে মাছ ছোঁ মেরে নেবার জন্যে চিল উড়চে, পাঁকের উপরে নিরীহ বক দাঁড়িয়ে আছে, শৈবালের উপরে ছোটো ছোটো কচ্ছপ আকাশের দিকে সমস্ত গলা বাড়িয়ে দিয়ে রোদ পোহাচ্ছে, নদীর নীরব খরস্রোতে ঝুপঝাপ ক'রে পাড় খ'সে খ'সে পড়চে, পানকৌড়ি সাঁতার দিচ্চে, রাখাল বালক গরু চরাচ্চে,—এই তো আমাদের সোনার বাংলার চিরন্তন ছবি। কত সন্ধ্যায়, কত প্রভাতে নির্ণিমেষ নয়নে এই ছবি দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ আর বিচিত্র ভাষায় বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন এই ছবি দেখার অপূর্ব্ব আনন্দকে।

ফাল্গুনের এ আলোয় এই গ্রাম ওই শূন্য মাঠ
ওই খেয়াঘাট
ওই নীল নদীরেখা, ওই দূর বালুকার কোলে
নিভৃত জলের ধারে চখাচখি কাকলী-কল্লোলে

যেখানে বসায় মেলা—এই সব ছবি
কতদিন দেখিয়াছে কবি !

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এমন অতৃপ্ত কৌতূহল নিয়ে আর কেউ বোধ হয় বাংলাদেশকে দেখেনি।

মুমূর্ষু যেমন ক'রে পৃথিবী থেকে চিরবিদায়ের আগে চেয়ে দেখে এই ধরণীর শ্যামচ্ছবি, কারাগারের গবাক্ষপথে বন্দী যেমন ক'রে চায় আকাশের নীলিমার পানে, তেমনি আগ্রহভরা দৃষ্টির অতৃপ্ত পিপাসা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন এই বাংলার পল্লী-প্রকৃতিকে। ছিন্নপত্রের পাতায় পাতায় তারই পরিচয় পাই ; গল্পগুচ্ছের কাহিনীর পর কাহিনীতে পল্লীর অসংখ্য চিত্র অম্লান সৌন্দর্য্যে বেঁচে আছে ; অসংখ্য গীতি-কবিতায় বাংলা দেশের পল্লীর বিচিত্র দৃশ্যগুলিকে তিনি রূপায়িত ক'রেছেন। তাঁর উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ এবং পত্রাবলী যখনই আমরা পাঠ করি তখনই বাংলাদেশ তার দিগন্তপ্রসার ক্ষেত্রের উদার শান্তি, তার নদীর তরল কল্লোলরোল, তার স্নিগ্ধ পল্লীগৃহ, তার শীতল তরুচ্ছায়া, তার অরণ্যের মর্ম্মরধ্বনি, তার মৌমাছির গুন্ গুন্, তার আকাশের প্রান্তে সূর্য্যাস্তের দীপ্তি, তার ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি খেলা, তার দীর্ঘ ঘন কাশবন, পাটের ক্ষেত, আখের ক্ষেত আর সারি সারি গ্রাম নিয়ে আমাদের মনের মধ্যে জীবন্ত হ'য়ে দেখা দেয়। শিলাইদহের সেই অজ্ঞাতবাসের যুগে পল্লী ছিলো তাঁর দিবারাত্রির সঙ্গিনী।

পদ্মার নিভৃত পরিচর্য্যায় পরিতৃপ্ত কবি সেদিন আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছিলেন পল্লীজননীর পদপ্রান্তে। অপেক্ষাকৃত অখ্যাত ছিলেন ব'লে কোলাহলময় জনতার হাটে সেদিন তাঁর ডাক পড়েনি। বোটটাকে নদীর মাঝখানে বেঁধে রেখেছেন আর সেখানে চুপচাপ ক'রে ব'সে সারাবেলা কেবল মুগ্ধনয়নে দেখেছেন বাংলার নিভৃত পল্লীর বিচিত্র রূপ। জীবনে প্রত্যহ একটি একটি ক'রে দিন এসেছে—কোনটি সূর্য্যোদয়-সূর্য্যাস্তে রাঙা, কোনটি ঘনঘোর মেঘে স্নিগ্ধ শীতল, কোনটি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় সাদা ফুলের মত প্রফুল্ল। এ দিনগুলির দিকে লক্ষ্য ক'রে কবি লিখেছেন,—এগুলি কি আমার কম সৌভাগ্য! জনতার কোলাহল থেকে দূরে উদ্যানগৃহের নির্জ্জনতায় গ্যেটেরও এমনি বহুদিন কেটেছিল পরম সৌভাগ্যের মধ্যে। মাটির সঙ্গে, ফুলের সঙ্গে, লতার সঙ্গে গ্যেটের সেই গভীর আত্মীয়তার যুগে যে আনন্দ তিনি শিরায় শিরায় অনুভব করেছিলেন তাকে লক্ষ্য ক'রে ডায়েরীতে তিনি লিখেছিলেন, These most exquisite days continue.

বাংলার পল্লীপ্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি ভালো বেসেছেন তা দেখাবার জন্য তাঁর ডায়েরী থেকে এখানে কয়েকটী লাইন উদ্ধৃত করছি। শিলাইদহে লেখা ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ মে'র ডায়েরীতে আছে, "এমন সন্ধ্যা হয়তো অনেক পেতেও পারি কিন্তু সে সন্ধ্যা এমন নিস্তব্ধভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে আমার বুকের উপরে এতো সুগভীর ভালোবাসার সঙ্গে পড়ে থাকবে না। আমি কি ঠিক

এম্‌নি মানুষটি তখন থাক্‌বো! আশ্চর্য্য এই, আমার সবচেয়ে ভয় হয়—পাছে আমি ইউরোপে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি।······ হয়তো একটা কারখানায় নয়তো ব্যাঙ্কে, নয়তো পার্লামেণ্টে সমস্ত দেহমনপ্রাণ দিয়ে খাটতে হবে।" পদ্মার নিভৃত চরের শান্ত দিন এবং শান্ত সন্ধ্যাগুলিকে তিনি এমন ভাবেই ভালো বেসেছিলেন যে, মনে তাঁর ভয় হ'তো, পাছে পরজন্মে পদ্মার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে এবং ইউরোপে তাঁকে জন্মগ্রহণ করতে হয়। ইউরোপে জন্মালে তাঁর প্রভাত-সন্ধ্যা এমন অবর্ণনীয় মাধুর্য্যে তো ভ'রে উঠবেনা, মাতৃকলকণ্ঠের মত পদ্মার কলধ্বনি তাঁর কানে এমন ক'রে বাঁশি বাজাবে না।

লোকে যখন বলে, রবীন্দ্রনাথ অভিজাত-সম্প্রদায়ের কবি, অট্টালিকার বাতায়ন-পথে দূর থেকে পল্লী-প্রকৃতিকে তিনি দেখেছেন, বাংলার কোমলা উর্ব্বরা ভূমির গ্রাম্যসুরটীকে তাঁর বীণার তারে তিনি প্রকাশ করতে পারেন নি, তখন দুঃখ হয় তাদের অজ্ঞতার কথা ভেবে। অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে শহুরে আবহাওয়ার মধ্যে জীবনের বহুদিন অতিবাহিত করলেও পল্লীকে তিনি একটি দিনের জন্যও উপেক্ষা করেন নি; তাকে সমস্ত তনুমন দিয়ে তিনি ভালোবেসেছেন—যেমন ক'রে মাকে ভালোবাসে ছেলে। তাঁর চেতনাকে কেবল শহরের অমিত রায় আর লাবণ্য, শশাঙ্ক আর উর্ম্মিমালা, আদিত্য আর নীরজার মধ্যে ব্যাপ্ত ক'রে দিয়ে তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। সেই বিশাল দরদী মনের সুতীব্র চেতনা শহরের গণ্ডীকে অনায়াসে অতিক্রম ক'রে ছড়িয়ে পড়েছে পল্লীর অখ্যাতনামা

অশিক্ষিত, অগণিত নরনারীর মধ্যে। তাদের মধ্যে আপনার সত্তাকে প্রসারিত ক'রে দিয়ে তিনি পল্লী-জীবনের ছোটোখাটো সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ বলে অনুভব ক'রেছেন, তাদের অন্তরের মহত্ত্বের কাছে নিজের শ্রদ্ধানত হৃদয়ের নৈবেদ্য অকুণ্ঠিতচিত্তে পৌঁছে দিয়েছেন, তাদের ক্ষুদ্রপরিসর জীবনের হাসি ও অশ্রুকে গানে গানে গেঁথে তুলেছেন। তাই দেখতে পাই, তাঁর সাহিত্যের মধ্যে বিলাত-ফেরৎ মোটর-বিহারী অমিত রায়ের পাশে উলাপুর গ্রামের দরিদ্র পোষ্ট-মাষ্টারটি অনাথা পল্লী-বালিকা রতনকে প্রথমভাগ পড়াচ্ছে। এই পোষ্টমাষ্টারটির সম্পর্কে ছিন্নপত্রে লেখা আছে, "বাতিটি জ্বালিয়ে টেবিলের কাছে কেদারাটি টেনে বইখানি হাতে যখন বেশ প্রস্তুত হ'য়ে বসেছি, হেনকালে কবি কালি-দাসের পরিবর্ত্তে এখানকার পোষ্টমাষ্টার এসে উপস্থিত। মৃত কবির চেয়ে একজন জীবিত পোষ্টমাষ্টারের দাবী ঢের বেশী। আমি তাঁকে বলতে পারলুম না,—আপনি এখন যান, কালিদাসের সঙ্গে আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে। বল্লেও সে লোকটি ভালো বুঝতে পারতেন না। অতএব পোষ্টমাষ্টারকে চৌকিটি ছেড়ে দিয়ে কালিদাসকে আস্তে আস্তে বিদায় নিতে হোলো।" মানুষের জীবনের প্রতি এই যে অপরিসীম শ্রদ্ধা—এই শ্রদ্ধা কবির কল্পনাকে শহরের একটা বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে দেয়নি। যে-কেউ এসেছে তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে, তার দাবীকে তিনি স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। যেমন কালিদাসকে আসন দিতে গিয়ে তিনি গ্রামের

অর্দ্ধশিক্ষিত পোষ্টমাষ্টারকে বিদায় দিতে পারেন নি, তেমনি তিনি অস্বীকার করতে পারেননি গ্রাম্যবালিকা গিরিবালাকে। অক্সফোর্ডের পাশ-করা কেতকী মিত্রের পাশে কথামালা ও চারুপাঠখানি হাতে নিয়ে শশিভূষণের ছাত্রী এবং হরকুমারের কন্যা গিরিবালা সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। কবি যেমন অমিত রায়ের সঙ্গে পোষ্টমাষ্টারকে এবং শহরের কেতকী মিত্রের সঙ্গে গ্রামের গিরিবালাকে পাশাপাশি এঁকেছেন তেমনি শেষের কবিতায় যোগমায়ার পাশে গল্পগুচ্ছের দিদিকে সমান আসন দান করেছেন। শশী পল্লীবাসিনী অশিক্ষিতা নারী হ'লেও চরিত্রের দৃঢ়তা এবং উদারতার দ্বারা কবি-হৃদয়ের শ্রদ্ধা অনায়াসে অর্জ্জন করেছে। কুমু, সুমিত্রা এবং লাবণ্যের উপরে কবি যে প্রশংসার পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, জয়গোপালের স্ত্রী এবং নীলমণির দিদি গ্রাম্যনারী শশী তার থেকে বঞ্চিত হয় নি। দিদির ধূলি-ধূসরিত চরণে আমাদের শির শ্রদ্ধায় বারংবার লুটিয়ে পড়ে। যেমন গিরিবালাকে, শশীকে, রতনকে, পোষ্টমাষ্টারকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যের দরবারে গৌরবের আসন দিয়েছেন, তেমনি আসন দিয়েছেন যাত্রাদলের গৃহত্যাগী ছোকরা তারাপদকে। অন্তরের মধ্যে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং মুক্ত তারাপদর ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী না থাক্‌লেও রবীন্দ্র-সাহিত্যে তার সম্মানের আসনটিকে সে অধিকার ক'রে আছে। নগরের কোনো অমিত রায় আর নিখিলেশের চেয়ে তার সম্মান কম নয়। জিমন্যাষ্টিকের দলের তারাপদর সঙ্গে গল্পগুচ্ছের পল্লীবাসিনী নিরক্ষর

বোষ্টমীটীও রবীন্দ্র-সাহিত্যে অমর হ'য়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে পল্লীর এমনি কত অখ্যাতনামা নর-নারী ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে র'য়েছে। তাদের সকলের কাহিনী এখানে লিপিবদ্ধ করতে গেলে প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হ'য়ে পড়বে।

এইটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট হবে, রবীন্দ্রনাথকে যারা অভিজাত শ্রেণীর শহুরে কবি ব'লে নিন্দা করে, তারা আপন বুদ্ধিকেই অপমানিত করে। কোন প্রথমশ্রেণীর জাতীয় কবিই আপনাকে বিশেষ কোন গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেন না। গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে বাঁধা পড়তে দিলেই প্রতিভার অবনতি ঘটে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা প্রথমশ্রেণীর প্রতিভা। তিনি বাংলার জাতীয় কবি। সেইজন্য তাঁর সাহিত্যে পল্লী এবং শহর, অট্টালিকা এবং কুটীর, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত—সবাই আসন পেয়েছে। পল্লীকে তিনি উপেক্ষা করেছেন তাঁর সাহিত্যে, জনসাধারণের প্রাণের স্পন্দন নেই তাঁর লেখায়, মহামানবের বিশাল হাট থেকে আপনাকে দূরে সরিয়ে এনে শান্তিনিকেতনের শালের ছায়ায় কেবল কল্পনার সোনালী জাল বুনেছেন তিনি—এসব তাদেরই কথা যারা তাঁর লেখা ভালো ক'রে পড়েনি অথবা প'ড়েও তাঁকে লোকচক্ষে ছোট করতে চায়।

(২)

একদা সাহিত্য ছিলো অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবন-নাট্যের মুকুর। বিরাট মানব-পরিবারের একপ্রান্তে যে একদল মুষ্টিমেয় নরনারী বিলাসের প্রাচুর্য্যের মধ্যে আপনাদের অস্তিত্বকে বহন ক'রে চলেছে—তাদের নিয়ে ছিল সাহিত্যের কারবার। সেদিনের সাহিত্যে ছিলো রাজা-বাদসাদের মুকুট-মণির দীপ্তি, রাজনন্দিনী এবং বাদসা-দুহিতাদের গোপন প্রেমের কাহিনী, পৌরাণিক দেবদেবীগণের অলৌকিক মহিমা, দিগ্বিজয়ী মহারথীদের অসির ঝঙ্কার ও ধনুকের টঙ্কার। মানুষের মধ্যে যারা অসাধারণ, তারাই ছিল সেদিন কাব্যের ও উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা; যারা সাধারণ, তারা ছিল সাহিত্যে অস্পৃশ্য।

তারপর এলো আর একদিন—সাহিত্যের ইতিহাসে যাকে আমরা বলতে পারি যুগান্তকারী বিপ্লবের দিন। এতকাল ধ'রে যারা ছিল কাব্যের উপেক্ষিত, তারা এসে অধিকার করলো সাহিত্যিকের কল্পনাকে। এলো কামার, এলো ছুতার, এলো মজুর; এলো কৃষক, এলো রাখাল, এলো ধীবর; এলো মিস্ত্রী, এলো মাঝি, এলো মালাকর; এলো মুচি, এলো মেথর, এলো ঝাড়ুদার; এলো নাবিক, এলো গাড়োয়ান, এলো তবলদার; এলো পতিতা, এলো কয়েদী, এলো ক্রীতদাস। সাহিত্যিকের কান এতদিন ধ'রে শুনে এসেছিলো নূপুরের নিক্কণ আর কাঁকনের কিঙ্কিণী, এসরাজের কান্না আর সেতারের ঝঙ্কার,

পাপিয়ার সঙ্গীত আর ঝরণার কলগীতি। নূতন সাহিত্যিকের কান শুনলো নূতন প্রভাতের মহাসঙ্গীত। তিনি গাইলেন,—

I hear America singing, the varied carols I hear,
Those of mechanics, each one singing his
as it should be blithe and strong,
The carpenter singing his as he measures his
plank or beam,
The mason singing his as he makes ready for
work, or leaves off work,
The boatman singing what belongs to him in
his boat, the deck-hand singing on the
steamboat deck,
The shoemaker singing as he sits on his bench,
the hatter singing as he stands,
The wood-cutter's song, the ploughboy's on
his way in the morning, or at noon inter-
mission or at sundown,
The delicious singing of the mother, or of the
young wife at work, or of the girl sewing
or washig,
Each singing what belongs to him or her and
to none else,
The day what belongs to-day—at night the
party of young fellows, robust, friendly
Singing with open mouths their strong
melodious songs.

আমি শুনতে পাচ্ছি আমেরিকা গান করছে, বিচিত্র সঙ্গীতের রেশ আসছে আমার কর্ণকুহরে,
আমি শুনতে পাচ্ছি মিস্ত্রীদের কণ্ঠধ্বনি, জোরালো কণ্ঠে তারা প্রত্যেকে গাইছে তাদের পুলক-ভরা গান,
গান গাইতে গাইতে সূত্রধর মাপছে তার তক্তা আর কড়ি-বরগা,
কাজের সুরুতে অথবা কাজের অবসানে রাজমিস্ত্রী গাইছে তার গান,
মাল্লার কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হচ্ছে তার নৌকার সঙ্গীত, ইষ্টিমারের ডেক থেকে শোনা যাচ্ছে খালাসীর আনন্দ গান,
বেঞ্চিতে ব'সে গান করছে চর্ম্মকার, টুপিওয়ালাও গান গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে,
আমি শুনতে পাচ্ছি তবলদারের গান, সকাল বেলায় কৃষক-বালক গান গাইতে গাইতে চ'লেছে তার কাজে, দ্বিপ্রহরের অবসরে এবং সন্ধ্যাবেলাতেও তার সঙ্গীতের বিরাম নেই,
মাধুর্য্য-ভরা কণ্ঠে জননী গায় তার গান, গৃহকার্য্যে ব্যস্ত তরুণী বধূর কণ্ঠসঙ্গীত আস্‌ছে কানে, সেলাই করতে করতে অথবা কাপড় কাচতে কাচতে বালিকা গান করে মৃদুগুঞ্জনে,
নারী এবং পুরুষ—প্রত্যেকে তার নিজের নিজের গান করে.
দিবসকে মুখরিত ক'রে জাগছে দিবসের গান, রাতের বেলায় যোয়ান যোয়ান ছেলেরা হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় এবং কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে মুক্তগলায় গাইছে তাদের জোরালো মধুর সঙ্গীত।

সাহিত্যে এতকাল যারা ছিল অস্পৃশ্য—সেই উপেক্ষিত অনাদৃত মহামানবের অখ্যাত জীবনের মধ্যে যিনি প্রথম আবিষ্কার করলেন কাব্যের উপাদান, তাঁর নাম ওয়াল্ট হুইটম্যান। তিনিই প্রথম তারস্বরে ঘোষণা করলেন, সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য কল্পনাকে সুদূর অতীতে পৌরাণিক দেব-দেবীদের কাছে পাঠিয়ে দেবার কোনো প্রয়োজন নেই ; উঁচুদরের কাব্য রচনার জন্য অসাধারণ লোকেরা অপরিহার্য্য নয়। তিনি দেখলেন, কৃত্রিম জীবনের বিলাসিতার মধ্যে অট্টালিকায় যে কবিতা আছে, তার চেয়ে অনেক বেশী কবিতা রয়েছে মুক্ত আকাশের তলায় কোটী-কোটী সাধারণ নর-নারীর বিচিত্র জীবন-প্রবাহের মধ্যে। বাণীর নিভৃত কমল-কাননের কোমল বীণা-ধ্বনি বাজতো যেখানে, সেখানে তিনি জাগালেন মহা-সাগরের কলকল্লোল। সাধারণ মানুষকে অনাদরের ভস্মস্তূপ থেকে তিনি তুলে আনলেন সাহিত্যের দরবারে, তার ধূলিমাখা ললাটে পরিয়ে দিলেন গানের পুষ্পমাল্য।

আমেরিকার সাহিত্যে হুইট্‌ম্যান যে নূতন সুরটিকে জাগালেন, বাংলার সাহিত্যে সেই সুর জাগিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। হুইটম্যানের কবিতায় আমেরিকা যেমন তার পর্ব্বত এবং সমুদ্র, অরণ্য এবং প্রান্তর, নদী এবং উপত্যকার পটভূমিতে সাধারণ মানুষকে নিয়ে জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যেও বাংলাদেশ তেমনি তার পল্লবঘন আম্রকানন, দিগন্ত-ব্যাপী উদার প্রান্তর, নদীতীরের ছায়াময় নীলবনরেখা, জনহীন ভগ্নমন্দির, ঘুঘুর ডাকে মুখরিত বাঁশঝাড়, সন্ধ্যারতির কাঁসর-

ঘণ্টার সুমিষ্ট শব্দতরঙ্গ, অন্ধকার-জড়িত বনবেষ্টিত সুপ্তপ্রায় গ্রাম, পাখীদের করুণ কলধ্বনিপূর্ণ স্বপ্নাবেশময় শরৎ-মধ্যাহ্ন, জলধারা-প্রফুল্ল শস্যের ক্ষেত, উলঙ্গ ছেলেমেয়েদের খেলার কলরব, রাখালের করুণ উচ্চস্বরে গান, তালগাছ-ঘেরা বড় বড় পুষ্করিণী এবং পদ্মার নিভৃত চরের চখাচখীর কাকলী-কল্লোলের পটভূমিতে সাধারণ বাঙালীকে নিয়ে জীবন্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। ছিন্নপত্রের এক জায়গায় আছে, "আমার এই সাজাদপুরের দুপুর বেলা—গল্পের দুপুর বেলা। মনে আছে, ঠিক এই সময়ে এই টেবিলে ব'সে আপনার মনে ভোর হ'য়ে 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পটা লিখেছিলুম। আমিও লিখছিলুম এবং আমার চারি দিকের আলো, বাতাস ও তরু-শাখার কম্পন তাদের ভাষা যোগ ক'রে দিচ্ছিল।" রবীন্দ্রনাথের অজস্র লেখার মধ্যে আমরা যে এত আনন্দের সন্ধান পাই, তার নিগূঢ় রহস্যটি উপরের লাইন কয়েকটির মধ্যেই নিহিত হ'য়ে আছে। বাংলা দেশের অন্তঃপুরচারিণী নদীগুলির কূলে কূলে কেটেছে তাঁর জীবনের বহুদিবস এবং বহুরাত্রি। পদ্মা তাঁর লেখার মধ্যে ভ'রে দিয়েছে তরল কল্লোল-রোল, স্নানার্থিনী জনপদ-বধূদের উচ্চকণ্ঠের কলধ্বনি মিশে আছে তাঁর রচনায়, শরৎকালের অপর্য্যাপ্ত জ্যোতির্ম্ময় নীলাকাশ তাঁর কবিতার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে হৃদয়ের অফুরন্ত খুসীকে, বাংলা দেশের ধূ ধূ জনহীন মাঠ এবং তার প্রান্তবর্ত্তী গাছপালার মধ্যে সূর্য্যাস্ত তাঁর ছন্দের মধ্যে ব্যাপ্ত ক'রে দিয়েছে বিশাল শান্তি এবং কোমল করুণা, আমবাগানের ঘনচ্ছায়া, বর্ষাকালের স্নিগ্ধ

মেঘাচ্ছন্ন আনত আকাশ, কোকিলের কুহুকুহুরিত বিরহরোদন, নারকেল পাতার ঝুরঝুর কাঁপুনি তাদের ভাষাকে যোগ ক'রে দিয়েছে তাঁর ভাষার সঙ্গে। যে সৌন্দর্য্য এই ছায়াময় নদী-স্নেহবেষ্টিত প্রচ্ছন্ন বাংলার একান্তভাবে নিজস্ব সৌন্দর্য্য—রবীন্দ্রনাথের লেখায় তার অপূর্ব্ব প্রকাশ। এইজন্যই বাঙালীর হৃদয়কে তিনি এমন ক'রে অধিকার করেছেন। তাঁর লেখার মধ্যে আমাদের চিরপরিচিত সোনার বাংলাকে আমরা নতুন ক'রে আবিষ্কার করি, তাঁর সাহিত্যে চিরপীড়িত, ধৈর্য্যশীল, স্বজনবৎসল, বাস্তুভিটাবলম্বী, শান্ত বাঙালীর কাহিনীর সঙ্গে আমাদের গভীর পরিচয় ঘটে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার শিকড় রয়েছে বাংলার মর্ম্মের মধ্যে। বাংলাদেশের পল্লী-প্রকৃতিকে এবং বাংলাদেশের পল্লীর সাধারণ মানুষকে কত গভীর দরদের সঙ্গে তিনি পর্য্যবেক্ষণ করেছেন, তারই একটু-আধটু পরিচয় দেবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। যাকে বলে গণতান্ত্রিক সাহিত্য, যে সাহিত্যের উপাদান সংগৃহীত হ'য়ে থাকে সাধারণ নরনারীর সুখ-দুঃখের কাহিনী থেকে, যার শিকড় থাকে দেশের মাটীর মধ্যে নিহিত, যার মধ্যে আমরা শুনতে পাই সাধারণ মানুষের হৃদয়-স্পন্দন, বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথকে সেই সাহিত্যের একজন অগ্রদূত ব'লে আমরা অনায়াসে ঘোষণা করতে পারি।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লী-চিত্র আঁকতে গিয়ে প্রথমেই আমরা যে লাইন কয়টি এখানে উদ্ধৃত করছি—তাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে 'চিত্রা'য়। বংলাদেশের পল্লীর এমন একটি

নিখুঁত ছবি এই লাইন কয়টিকে আশ্রয় ক'রে ফুটে উঠেছে —বাংলা সাহিত্যে যার তুলনা পাওয়া কঠিন।

"ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল-কল্লোলে; অৰ্দ্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে; ভাঙা উচ্চতীর;
ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু; প্রচ্ছন্ন কুটীর;
বক্র শীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হ'তে
শস্য ক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষার্ত্ত জিহ্বার মতো; গ্রামবধূগণ
অঞ্চল ভাসায়ে জলে আকণ্ঠ মগন
করিছে কৌতুকালাপ; উচ্চ মিষ্ট হাসি
জলকলস্বরে মিশি পশিতেছে আসি
কর্ণে মোর; বসি এক বাঁধা নৌকা 'পরি
বৃদ্ধ জেলে গাঁথে জাল নত শির করি
রৌদ্রে পিঠ দিয়া; উলঙ্গ বালক তার
আনন্দে ঝাঁপায়ে জলে পড়ে বারম্বার
কলহাস্যে; ধৈর্য্যময়ী মাতার মতন
পদ্মা সহিতেছে তার স্নেহজ্বালাতন।
তরী হ'তে সম্মুখেতে দেখি দুই পার;
স্বচ্ছতম নীলাভ্রের নির্ম্মল বিস্তার;
মধ্যাহ্ন আলোক প্লাবে জলে স্থলে বনে

বিচিত্র বর্ণের রেখা ; আতপ্ত পবনে
তীর-উপবন হ'তে কভু আসে বহি
আম্রমুকুলের গন্ধ, কভু রহি রহি
বিহঙ্গের শ্রান্ত স্বর।"

বাংলাদেশের এমন একখানি অনবদ্য পল্লী-ছবি আমাদের সাহিত্যে সত্য সত্যই বিরল। তিনিই কেবল এমন ছবি আঁকতে পারেন যিনি পল্লীর সৌন্দর্য্যের মধ্যে আপনার চিত্তকে নিঃশেষে ডুবিয়ে দিতে পেরেছেন। এ যেন বাংলার পদ্মাতীরের একখানি নিখুঁত ফটোগ্রাফ।

রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে পদ্মার আর একখানি ছবি আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি। এই মনোহর ছবিখানি আছে 'বলাকা'য়।

"শূন্য প্রান্তরের গান বাজে ওই একা ছায়াবটে ;
নদীর এপারে ঢালুতটে
চাষী করিতেছে চাষ ;
উড়ে চলিয়াছে হাঁস
ওপারের জনশূন্য তৃণশূন্য বালুতীরতলে।
চলে কি না চলে
ক্লান্তস্রোত শীর্ণ নদী, নিমেষ-নিহত
আধ-জাগা নয়নের মত।
পথখানি বাঁকা
বহু শত বরষের পদ-চিহ্ন-আঁকা

চলেচে মাঠের ধারে—ফসল ক্ষেতের যেন মিতা—
নদী সাথে কুটীরের বহে কুটুম্বিতা।”

রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, গল্পে, গানে বাঙলার পল্লী-প্রকৃতির এমন কত যে ছবি মণিমুক্তার মত ছড়িয়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই। ‘সোণার তরী’তে ‘আকাশের চাঁদ’ ব’লে যে কবিতাটি আছে তার মধ্যে এই লাইন কয়টীতে পল্লীর কি মধুর ছবিটি ফুটে উঠেছে !

সোণার ক্ষেত্রে কৃষাণ বসিয়া
কাটিতেছে পাকা ধান,
ছোটো ছোটো তরী পাল তুলে যায়
মাঝি বসে গায় গান।
দূরে মন্দিরে বাজিছে কাঁসর,
বধূরা চলেছে ঘাটে,
মেঠো পথ দিয়ে গৃহস্থ জন
আসিছে গ্রামের হাটে।

অথবা—

নমোনমো নমঃ সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি !
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগন ললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন, রাখালের স্নেহ-গেহ ;
স্তব্ধ অতল দীঘি-কালোজল, নিশীথ-শীতল স্নেহ।

বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল ল'য়ে যায় ঘরে,
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান চোখে আসে জল ভরে।

বাঙলাদেশের এই অপূর্ব্ব-সুন্দর পল্লীচিত্রটী বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে কোহিনুরের মতই দীপ্তি পাচ্ছে।

"হের ক্ষুদ্র নদীতীরে
সুপ্তপ্রায় গ্রাম ; পক্ষীরা গিয়েছে নীড়ে,
শিশুরা খেলেনা, শূন্যমাঠ জনহীন ;
ঘরে ফেরা শ্রান্ত গাভী গুটী দুই তিন
কুটীর-অঙ্গনে বাঁধা, ছবির মতন
স্তব্ধপ্রায়। গৃহকার্য্য হ'ল সমাপন,—
কে ওই গ্রামের বধূ ধরি বেড়াখানি
সম্মুখে দেখিছে চাহি, ভাবিছে কী জানি
ধূসর সন্ধ্যায়।"

বাঙলাদেশের নদীতীরে নিভৃত পল্লীর বুকে যখন সন্ধ্যার ম্লান ছায়া ঘনিয়ে আসে তখন এই ছবিই সেখানে প্রতিদিন জেগে ওঠে। বাঙলাদেশের পল্লীর সঙ্গে গভীরতম পরিচয় না থাকলে ভাষার যাদুকে আশ্রয় ক'রে সন্ধ্যার এমন নিখুঁত ছবি অঙ্কিত করা একান্তই কঠিন।

এবার রবীন্দ্রনাথের গদ্য-সাহিত্য থেকে দুএকটী পল্লী-চিত্র পাঠকপাঠিকাগণকে উপহার দেবো। গল্পগুচ্ছের দ্বিতীয় খণ্ডে 'অতিথি' ব'লে যে কাহিনীটী র'য়েছে তারই মধ্যে এই চিত্রটী আছে।

'আকাশে নব বর্ষার মেঘ উঠিল। গ্রামের নদী এতদিন শুষ্ক-প্রায় হইয়াছিল, মাঝে মাঝে কেবল এক একটা ডোবায় জল বাধিয়া থাকিত, ছোটো ছোটো নৌকা সেই পঙ্কিল জলে ডোবানো ছিল এবং শুষ্ক নদীপথে গরুর গাড়ী চলাচলের সুগভীর চক্র-চিহ্ন খোদিত হইতেছিল—এমন সময় একদিন পিতৃগৃহ-প্রত্যাগত পার্ব্বতীর মতো কোথা হইতে দ্রুতগামিনী জলধারা কলহাস্যসহকারে গ্রামের শূন্যবক্ষে আসিয়া সমাগত হইল—উলঙ্গ বালক-বালিকারা তীরে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে নৃত্য করিতে লাগিল, অতৃপ্ত আনন্দে বারম্বার জলে ঝাঁপ দিয়া নদীকে যেন আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে লাগিল, কুটীরবাসিনীরা তাহাদের পরিচিত প্রিয়-সঙ্গিনীকে দেখিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল,—শুষ্ক নির্জীব গ্রামের মধ্যে কোথা হইতে এক প্রবল বিপুল প্রাণহিল্লোল আসিয়া প্রবেশ করিল। দেশবিদেশ হইতে বোঝাই হইয়া ছোটো বড়ো নানা আয়তনের নৌকা আসিতে লাগিল, বাজারের ঘাট সন্ধ্যাবেলায় বিদেশী মাঝির সঙ্গীতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। দুই তীরের গ্রামগুলি সম্বৎসর আপনার নিভৃত কোণে আপনার ক্ষুদ্র ঘরকন্না লইয়া একাকিনী দিন যাপন করিতে থাকে, বর্ষার সময় বাহিরের বৃহৎ পৃথিবী বিচিত্র পণ্যোপহার লইয়া গৈরিকবর্ণ জল-রথে চড়িয়া এই গ্রামকন্যাগুলির তত্ত্ব লইতে আসে; তখন জগতের সঙ্গে আত্মীয়তাগর্ব্বে কিছুদিনের জন্য তাহাদের ক্ষুদ্রতা ঘুচিয়া যায়, সমস্তই সচল, সজাগ, সজীব হইয়া উঠে এবং মৌন নিস্তব্ধ দেশের মধ্যে সুদূর রাজ্যের কলালাপধ্বনি আসিয়া চারিদিকের আকাশকে আন্দোলিত করিয়া তুলে।"

বাঙলার নদীতীরস্থ পল্লীগুলিতে নববর্ষার আবির্ভাব বৎসরে বৎসরে যে নব জীবনের চাঞ্চল্য নিয়ে আসে তার এমন অনবদ্য মূর্ত্তি বাঙলা-সাহিত্যে সুদুর্লভ। এই চিত্র কেবল তাঁরই পক্ষে আঁকা সম্ভব যিনি সমস্তসত্তা দিয়ে দীর্ঘকাল ধ'রে বর্ষার পল্লীচিত্রকে পর্য্যবেক্ষণ করেছেন। বাঙলা দেশের বর্ষার এই চঞ্চল নদীর পটভূমিতে তারাপদ নামক যে আসক্তিবিহীন উদাসীন বালকটী দাঁড়িয়ে আছে তার ভবঘুরে স্বভাবটি নিয়ে, তার ছবিটিও বাঙালা সাহিত্যে একটি অমূল্য সম্পদ।

সুভাষিণীর পিতা চণ্ডীপুরের বাণীকণ্ঠ। বাঙলাদেশের একটী নিরলসা তন্বী নদীর তীরে বাণীকণ্ঠের ঘর। সেই ঘর-খানির বর্ণনা কি নিখুঁত। গল্পগুচ্ছের 'সুভা' নামক গল্পটীতে বাণীকণ্ঠের ঘরের বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—"বাণীকণ্ঠের ঘর একেবারে নদীর উপরেই। তাঁহার বাখারির বেড়া, আটচালা, গোয়াল ঘর, ঢেঁকিশালা, খড়ের স্তূপ, তেঁতুল তলা, আম-কাঁঠাল এবং কলার বাগান, নৌকাবাহী-মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।" এই গৃহখানির পটভূমিতে সুভানাম্নী যে বোবা বালিকাটী ব্যর্থতার অসীম বেদনা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে নির্জ্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন। এই পল্লী-বালার নিস্ফল জীবনের অসীম ট্র্যাজেডির ছবি পাঠকের মনে যে বেদনার রেখাপাত করে—তা সহজে মুছে যাবার নয়। গল্প পড়া যখন শেষ হয়ে যায় তখনও সুভা পাঠকের হৃদয়ে তার সুদীর্ঘপল্লববিশিষ্ট বড় বড় ছু'টি কালো চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সুভার পাশে গোঁসাইদের অকর্ম্মণ্য ছোটো ছেলে

প্রতাপ ছিপটি হাতে মাছ ধরছে। যেমন সুভা, তেমনি প্রতাপ। একটি বোবা গ্রাম্যবালিকা এবং একটি অকর্ম্মণ্য গ্রাম্যবালকের এই যে দু'খানি ছবি পাশা-পাশি আঁকা হয়েছে, বাঙলা-সাহিত্যে এদের তুলনা কোথায়? রবীন্দ্রনাথ কেবল শহরের উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চশিক্ষিতা নরনারীর চিত্র-অঙ্কনে দক্ষতা দেখিয়ে ক্ষান্ত থাকেন নি। তাঁর সুদূরপ্রসারী কল্পনা উদার বাহুর মধ্যে নিখিলের অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত সবাইকে টেনে নিয়েছে। যে লেখনী-মুখে নীরজার, সরলার, এলার, লাবণ্যের, কেতকী মিত্রের, কুমুর, উর্ম্মিলার, সুষমার এবং বাঁশরীর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে—সেই লেখনীই আবার উলাপুর গ্রামের সাব পোষ্টমাষ্টারের পিতৃমাতৃহীন, অনাথা পরিচারিকা রতনের মৌন বেদনাকে ভাষা দিয়েছে। যে শক্তিশালী হস্তের তুলিকা আদিত্য এবং শশাঙ্কের সুন্দর গৃহকে অঙ্কিত করেছে—সেই শক্তিশালী হস্তের তুলিকা-মুখেই আবার পোষ্টমাষ্টারের জীর্ণ ঘরখানি রূপায়িত হয়েছে। পোষ্টমাষ্টারের ঘরখানির বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "মিট্‌মিট্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং একস্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপ টপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।' বর্ষায় পল্লীগ্রামের জীর্ণঘরের একখানি অনবদ্য চিত্র!

'সমাপ্তি' গল্পে মৃণ্ময়ীর বাপ ঈশান মজুমদারের বর্ণনাটীও রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লীর একটি নিখুঁত ছবি। ঈশান মজুমদার নদীতীরবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশনে ষ্টীমার কোম্পানীর কেরাণী।

অপূর্ব্ব যখন মৃণ্ময়ীকে নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় কুশীগঞ্জে পৌঁছালো তখন দেখা গেল, "টিনের ঘরে একখানি ময়লা চৌকা-কাঁচের লণ্ঠনে তেলের বাতি জ্বালাইয়া ছোটো ডেস্কের উপরে একখানি চামড়ায় বাঁধা মস্ত খাতা রাখিয়া গা-খোলা ঈশানচন্দ্র টুলের উপর বসিয়া হিসাব লিখিতেছিলেন।" বর্দ্ধমান ষ্টেশনে 'পুরাতন ভৃত্য' কৃষ্ণকান্তের ছবিকে যেমন আমরা আজীবন মনের মধ্যে সযত্নে পোষণ করি, টিনের ঘরে টুলের উপরে বসা গা-খোলা ঈশান মজুমদারের ছবিখানিও তেমনি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে চিরন্তন হ'য়ে থাকে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে কেবল অমিত রায় নেই, ঈশানচন্দ্রও আছে, কেবল শহরের অট্টালিকা নেই, পল্লীর কুটীরও আছে। তাঁর সাহিত্য প'ড়ে Lin Yutangএর এই কথাই বারে বারে মনে জাগে, "Yes, life which is so poignantly beautiful is worth recording down to its lowliest details."

(৩)

যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়,
সকলি দুর্লভ ব'লে আজি মনে হয়।
দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান,
দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।

এই কয়েকটি লাইনের মধ্যে আমরা রবীন্দ্রনাথের গভীরতম মর্ম্মবাণীর পরিচয় পাবো। রবীন্দ্রনাথ কবি এবং কবি ব'লেই জীবনকে ভালোবেসেছেন তিনি। ইন্দ্রিয়ের দ্বারগুলিকে রুদ্ধ ক'রে বৈরাগ্যের মধ্যে মুক্তিকে খুঁজে বেড়ায় যারা, রবীন্দ্রনাথের আসন তাদের দলে নয়। জীবন দুঃখময়, আনন্দ রয়েছে জীবনের পরপারে—এমন কথা বলে যারা, তাদের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথকে আমরা পাবোনা। নির্ব্বাণের জয়গান নেই রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। এই মাটির পৃথিবীর প্রতিদিনের দৃশ্যে, গন্ধে, গানে যে সহজ আনন্দ রয়েছে, সেই আনন্দকে তিনি অনুভব করেছেন অন্তরের শিরায় শিরায়। এই জগৎ তার আলো-ছায়া, হাসি-কান্না নিয়ে অপরূপ হ'য়ে দেখা দিয়েছে তাঁর মনের সম্মুখে।

চক্ষে লাগে মম
প্রশান্ত আনন্দঘন অনন্ত আকাশ ;
শরৎ মধ্যাহ্নে পূর্ণ সুবর্ণ উচ্ছ্বাস

আমার শিরার মাঝে করিয়া প্রবেশ
মিশায় রক্তের সাথে আতপ্ত অবেশ।
ভুলায় আমারে সবে। বিচিত্র ভাষায়
তোমার সংসার মোরে কাঁদায় হাসায়;
তব নরনারী সবে দিগ্বিদিকে মোরে
টেনে নিয়ে যায় কত বেদনার ডোরে,
বাসনার টানে। সেই মোর মুগ্ধ মন
বীণাসম তব অঙ্কে করিনু অর্পণ,—
তার শত মোহতন্ত্রে করিয়া আঘাত
বিচিত্র সঙ্গীত তব জাগাও, হে নাথ।

যুগে যুগে কবিদের কণ্ঠ থেকে এই প্রার্থনাই উৎসারিত হ'য়ে এসেছে। মানুষের আত্মার আসন বিশ্বের কেন্দ্রে। চারিদিক থেকে সেই আত্মার কাছে কত যে অহ্বান আসছে নিমেষে নিমেষে। এই সকল আহ্বান কোন কোন চিত্তে আশ্চর্য্যরকমের সাড়া জাগাতে পারে। তুর্লভ হ'লেও এমন চিত্ত আছে যা সহস্র-তার-যুক্ত বীণার মত। জীবনের প্রতি-নিমেষের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সেই চিত্তবীণার তারে তারে বিচিত্র রকমের সুরকে জাগিয়ে তোলে। মুকুট-পরা রাজা আর মুকুটহীন সর্ব্বহারা, চরিত্রহীনা নারী আর সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, শ্মশানঘাটের বিলাপ আর বাসরঘরের কলহাস্য, সূর্য্যাস্তের দীপ্তি আর বর্ষণমুখর শ্রাবণরাত্রি—সব কিছুই সেই চিত্তে এমন একটি অনুভূতির সঞ্চার করে যার মধ্যে মুক্তি আছে, মাধুর্য্য

আছে, বিস্তার আছে। এই অনুভূতির মধ্যে চিত্ত আপনার অসীম ঐশ্বর্য্য এবং বিপুলতার সন্ধান পায়।

রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্ত জীবনের প্রভাত থেকেই জগতের আহ্বানে বিচিত্রস্বরে বেজে উঠেছে। যখন তাঁর শিশুকাল, তখন থেকেই মাটির পৃথিবীর প্রতি একটা দুর্ব্বার আকর্ষণ অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছেন তিনি। উত্তরকালে যিনি লিখেছিলেন,—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে।
ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।"

অথবা—

"ভালো মন্দ দুঃখ সুখ অন্ধকার আলো
মনে হয় সব নিয়ে এ ধরণী ভালো।"—

তাঁকে জীবন প্রথম থেকেই বাঁশি বাজিয়ে ডাক দিয়েছিলো। সেই ডাকে তখন থেকেই তাঁর হৃদয় উচ্ছ্সিত আবেগে বারম্বার সাড়া দিয়েছে—যখন তিনি ছিলেন নিতান্ত বালক। তাঁর বাল্যকালের এই অনুভূতির আমরা পরিচয় পাবো 'জীবনস্মৃতি'র গোড়ার দিকটায়। সেখানে আছে, "জানালার নীচেই একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্ব্ব-ধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট, দক্ষিণধারে নারিকেলশ্রেণী। গণ্ডি-বন্ধনের বন্দী আমি জানালার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্ত দিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মত দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম।" যে অসীম কৌতূহল নিয়ে যৌবনে তিনি পদ্মাতীরে পল্লীগুলিকে নিরীক্ষণ করেছিলেন, বাল্যজীবনের এই স্মৃতির মধ্যে সেই কৌতূহলেরই প্রথম পরিচয় পাই। এই অসীম-কৌতূহল নিয়েই বাল্যকালে ছাদের প্রাচীরের রন্ধ্রপথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি দেখতেন উঠানের কোণের উচ্ছিষ্ট ভাতের উপরে কাকের দলের সভা, বাড়ীর ভিতরের বাগানপ্রান্তের নারিকেলশ্রেণী, সিঙ্গিরবাগানপল্লীর পুষ্করিণী এবং সেই পুষ্করিণীর ধারে তারা গয়লানীর গোয়াল ঘর। এই সময়কার মনোভাবের বর্ণনা দিতে গিয়ে 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি লিখেছেন, "মাথার উপরে আকাশব্যাপী খর দীপ্তি, তাহারই দূরতম প্রান্ত হইতে চিলের সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ ডাক আমার কানে আসিয়া পৌঁছিত এবং সিঙ্গির-বাগানের পাশের গলিতে দিবাসুপ্ত নিস্তব্ধ বাড়ীগুলার সম্মুখ দিয়া পসারী সুর করিয়া "চাই, চুড়ি চাই, খেলনা চাই" হাঁকিয়া যাইত—তাহাতে আমার সমস্ত মন উদাস করিয়া দিত।"

বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি হৃদয়ের এই যে দুর্নিবার টান, গাছপালা, ফুল-ফল, পশু-পক্ষীর প্রতি অন্তরের এই যে সহজ অনুরাগ, পৃথিবীর রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শকে সমস্ত সত্তা দিয়ে উপভোগ করবার এই যে বিপুল ক্ষমতা—এর পরিচয় 'জীবন-স্মৃতি'র গোড়ার দিকটার অনেকগুলি পরিচ্ছেদে ফুটে উঠেছে। বাড়ীর ভিতরের বাগানটি তাঁর শৈশবকে যে আনন্দ দান করতো, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, "বাড়ীর ভিতরের বাগান আমার সেই স্বর্গের বাগান ছিল—সেই আমার যথেষ্ট ছিল। বেশ মনে পড়ে, শরৎকালের ভোরবেলায় ঘুম ভাঙিলেই এই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। একটি শিশির-মাখা ঘাস-পাতার গন্ধ ছুটিয়া আসিত, এবং স্নিগ্ধ নবীন রৌদ্রটী লইয়া আমাদের পূবদিকের প্রাচীরের উপর নারিকেল-পাতার কম্পমান ঝালরগুলির তলে প্রভাত আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দিত।" Child shows the man as morning shows the day—একথা যে কত সত্য, রবীন্দ্রনাথের শৈশবই তার প্রমাণ।

এক রকমের লোক আছেন যাঁরা জীবনের ছোট ছোট সহজ আনন্দগুলিকে উপভোগ করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁদের দৃষ্টি সর্ব্বদাই সুদূরে—নিকটে নয়। তাঁরা কাছের জিনিষকে দেখে থাকেন অবজ্ঞার চোখে, বর্ত্তমানকে মনে করেন অর্থহীন। ভবিষ্যৎ তাঁদের কাছে লোভনীয়। তাঁদের কারও কণ্ঠে নির্ব্বাণের কথা, কারও কণ্ঠে মুক্তির কথা, কারও কণ্ঠে বা প্রগতির কথা। সক্রেটিস যেমন বলতেন "ঝগড়াটে স্ত্রী স্বামীর

চরিত্র গঠনে সহায়তা করে”, তাঁরাও তেমনি বলেন, বর্ত্তমান জীবনের দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে মানুষ ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তৈরী হয়। জীবন তাঁদের কাছে কুইনিনের মতো তেতো কিন্তু উপকারী। তাঁদের মধ্যে মুক্তির পূজারী যাঁরা, তাঁদের কাছে জীবন একটা অভিশাপ। তাঁদের সারা জীবনের সাধনা হচ্ছে—বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে সরিয়ে এনে বাসনাকে নির্ম্মূল করা। প্রগতির কথা বলেন যাঁরা, তাঁরা জীবনকে অস্বীকার না করলেও জীবনের সহজ আনন্দগুলি থেকে বঞ্চিত। তাঁরা ক্রমাগত ছুটে চলেছেন তারই দিকে—যা নাগালের বাহিরে, তাঁদের দৃষ্টি কেবল উপকরণের পর উপকরণকে সংগ্রহ করার দিকে। কেবলই ছুটে চলার নেশায় মন যাঁদের ভোর হ'য়ে আছে, জীবনকে কেমন ক'রে ভোগ করতে হয়—সে কৌশল তাঁদের কাছে অজ্ঞাত। পরলোকের দিকে যাদের দৃষ্টি, ইহলোক তাদের কাছে তুচ্ছ। ‘নির্ব্বাণ' যাদের লক্ষ্য, জীবন তাদের কাছে উপেক্ষার বস্তু।

এই নির্ব্বাণ, মুক্তি, প্রগতি অথবা আত্মোন্নতির মোহ যাঁদের চিত্তকে অভিভূত ক'রে রেখেছে—কবিরা তাদের থেকে স্বতন্ত্র জীব। কবিদের জীবনের মূলমন্ত্র Here and Now. কবিরা বলেন, আনন্দ দূরে নেই, আনন্দ রয়েছে নিতান্ত কাছে। বর্ত্তমানের চূড়ায় চূড়ায় সহজ ছন্দে ভেসে চলতে জানে যে, সেই শুধু আস্বাদন করতে পারে স্বর্গের মাধুর্য্যকে। যা নিতান্ত কাছের, যা নিতান্ত সাধারণ, তার মধ্যে যে সৌন্দর্য্যকে দেখতে পারে, আনন্দের উপরে অবাধ অধিকার শুধু তারই। এই

সত্যকেই রবীন্দ্রনাথ অপরূপ ভাষায় প্রকাশ করেছেন নিম্নের কবিতায়।

"ফিরেছি সেই স্বর্গে শূন্যে শূন্যে
ফাঁকির ফাঁকা ফানুষ।
কত যে যুগ যুগান্তরের পুণ্যে
জন্মেছি আজ মাটির পরে ধূলা মাটির মানুষ।
স্বর্গ আজি কৃতার্থ তাই আমার দেহে,
আমার প্রেমে, আমার স্নেহে,
আমার ব্যাকুল বুকে,
আমার লজ্জা, আমার সজ্জা, আমার দুঃখে সুখে।"

অথবা—

"ধন্যরে আমি অনন্ত কাল,
ধন্য আমার ধরণী।
ধন্য এ মাটি, ধন্য সুদূর
তারকা হিরণবরণী।
যেথা আছি আমি, আছি তাঁরি দ্বারে,
নাহি জানি ত্রাণ কেন বলো কারে।
আছে তাঁরি পারে তাঁরি পারাবারে
বিপুল ভুবন-তরণী।
যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি
ধন্য এ মোর ধরণী।

এই যে মাটির উপরে ধূলি মাটির মানুষ হ'য়ে জন্মানোকে একটা প্রকাণ্ড সৌভাগ্য ব'লে অনুভব করবার ক্ষমতা, মৃত্তিকার কোলে স্বর্গের মহিমাকে দেখবার এই যে দুর্লভ দৃষ্টি, জীবনকে তার রৌদ্র-ছায়া, আলো-অন্ধকার নিয়ে ভোগ করবার এই যে শক্তি—এরই নাম **humanism.** রবীন্দ্রনাথ এই **humanism**এর পূজারী এবং সেই জন্যেই দূরের দিকে তাকিয়ে নিকটকে কখনই তিনি অবহেলা করেননি। সহজে যা তিনি পেয়েছেন—সহজেই তাকে তিনি মনের মধ্যে গ্রহণ করেছেন। অন্তরের একটি বাতায়নকেও তিনি রুদ্ধ ক'রে রাখেননি, তুচ্ছ ব'লে কাকেও তিনি প্রত্যাখ্যান করেননি। হৃদয়ের মুক্ত বাতায়ন-পথে চঞ্চল সংসার তার যত ভুল, যত ধূলি, যত দুঃখ-শোক, যত ভালো-মন্দ, যত গীত-গন্ধ নিয়ে অবাধে তাঁর চিত্তলোকে প্রবেশ করেছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লীচিত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে এত কথা বলতে হোলো—তার কারণ, তাঁর জীবনের আদর্শকে ঠিকমতো বুঝতে পারলে, তাঁকে জানার পথ প্রশস্ত হবে। রবীন্দ্রনাথ পল্লীকে যে এমন ক'রে ভালবাসতে পেরেছেন তার কারণ জীবনের প্রতি তাঁর চিত্তের অপরিমেয় অনুরাগ। কালস্রোতে ভাসতে ভাসতে একদা তাঁর জীবনের তরণীখানি বঙ্গদেশের একটী পল্লীর ঘাটে এসে থেমেছিলো। পল্লীর সরল জীবনকে সহজেই তিনি সেদিন গ্রহণ করতে পেরেছিলেন; কারণ শহরের আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হ'লেও ছেলেবেলা থেকেই জীবন আলো, বর্ণ আর গন্ধ দিয়ে তাঁর মনকে মুগ্ধ

করেছিলো। পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর প্রেমের খেলা সুরু হ'য়েছিল শৈশবের খেলাঘর থেকেই। তাই দেখি পদ্মা প্রেয়সীর মত তাঁর হৃদয়কে কখন নিঃশব্দে অধিকার ক'রে বসেছে! পদ্মার সঙ্গে তাঁর শুভদৃষ্টির পুণ্য মুহূর্ত্তটীকে তিনি অমর ক'রে রেখেছেন তাঁর 'পদ্মা' নামক কবিতায়।

'হে পদ্মা আমার!
তোমায় আমায় দেখা শত শতবার।
একদিন জনহীন তোমার পুলিনে,
গোধূলির শুভলগ্নে হেমন্তের দিনে,
সাক্ষী করি পশ্চিমের সূর্য্য অস্তমান,
তোমারে সঁপিয়াছিনু আমার পরাণ।
অবসান সন্ধ্যালোকে আছিলে সে দিন
নতমুখী বধূসম শান্ত বাক্যহীন;—
সন্ধ্যাতারা একাকিনী সস্নেহ কৌতুকে
চেয়ে ছিল তোমা পানে হাসিভরা মুখে!
সেদিনের পর হ'তে, হে পদ্মা আমার
তোমায় আমায় দেখা শত শতবার।"

পদ্মার সঙ্গে এই যে শত শতবার দেখা, ঋতুতে ঋতুতে এই যে তার সঙ্গে নির্জ্জনে মুখোমুখী হ'য়ে থাকা—তবুও নয়ন তৃপ্ত এবং প্রেম ক্লান্ত নয়। পরজন্মেও যাতে পদ্মার সঙ্গে তাঁর জীবনের বিচ্ছেদ না ঘটে, এই ব্যাকুল কামনা কান্না হ'য়ে তাঁর কণ্ঠ থেকে বারে বারে বেরিয়ে এসেছে।

"কত দিন ভাবিয়াছি বসি তব তীরে
পরজন্মে এ ধরায় যদি আসি ফিরে,
যদি কোনো দূরতর জন্মভূমি হ'তে
তরী বেয়ে ভেসে আসি তব খরস্রোতে,—
কত গ্রাম কত মাঠ কত ঝাউঝাড়
কত বালুচর কত ভেঙ্গে-পড়া পাড়
পার হ'য়ে এই ঠাঁই আসিব যখন
জেগে উঠিবে না কোনো গভীর চেতন ?
জন্মান্তরে শতবার যে নির্জ্জন তীরে
গোপনে হৃদয় মোর আসিত বাহিরে,—
আর বার সেই তীরে সে সন্ধ্যাবেলায়
হবে নাকি দেখা শুনা তোমায় আমায় !

এই যে নদী আর বন, মাঠ আর ফুল, আলো আর গানের সঙ্গে অন্তরের গভীর আত্মীয়তা—এটি, বোধ হয়, আমাদের বাঙালী জাতির একটি বৈশিষ্ট্য। ফুটবলের পিছনে পিছনে সারা মাঠ দৌড়ে বেড়াতে আমরা তত ভালোবাসি না যত ভালোবাসি অপরাহ্নের ম্লান আলোকে বিলের ধারে সবুজ ঘাসে বেড়িয়ে বেড়াতে। বকুলগাছ থেকে কোকিলের ডাক যখন কানে আসে, আশ্বিনের রাতে শিউলি ফুলের যখন গন্ধ পাই, হেমন্তের মাঠে মাঠে সোনালীধানের প্রাচুর্য্য যখন চোখের সামনে জেগে ওঠে, অতসী আর গাঁদা, দোপাটি আর টগর ঘরের আঙিনাকে যখন আলো ক'রে তোলে, উঠানে প্রভাত-সূর্য্যালোকে ফেন-শুভ্র গোবৎসটি যখন লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা

করে, রন্ধনশালায় যখন পরমান্ন আর পিঠাপুলি খাবার ডাক পড়ে, ভোরের বেলায় সানাইতে যখন ভৈরবীর সুকরুণ সুর বাজে—তখন আনন্দে আমাদের চিত্ত কানায় কানায় ভ'রে যায়। জীবনের প্রতিদিনের ছোটো ছোটো অসংখ্য আহ্বানে আমাদের শান্তিপ্রিয় চিত্ত অতি সহজেই সাড়া দেয়। ঋতুতে ঋতুতে তাই আমাদের উৎসবের শেষ নেই। ফাল্গুনে আমাদের অরণ্যগুলি যখন শিমূলের আর পলাশের প্রাচুর্য্যে রাঙা হ'য়ে যায়, রিক্ত শাখা-প্রশাখায় দেখা দেয় কচি কচি নতুন পাতা, আমরা তখন আবীর আর কুঙ্কুম নিয়ে সুরু করি হোলির উৎসব। আশ্বিনে যখন শিউলির গন্ধে বাতাস আকুল হ'য়ে ওঠে, বন এবং পর্ব্বত শিশিরে ঝলমল করে—তখন আমাদের পল্লীতে পল্লীতে বেজে ওঠে দুর্গোৎসবের নহবৎ। শ্রাবণের মেঘমেদুর আকাশের তলে নীপের বন যখন অজস্র পুলক-ভরা ফুলে পূর্ণ হয়, ভরানদীর কূলে কূলে যখন জাগে উচ্ছলজলের কলরোদন, তখন আমরা গাই ঝুলনের গান। জীবন বড় ক্ষণিক—প্রভাতের ফোটা ফুল সন্ধ্যায় পড়ে ঝ'রে—শিশুর কাকলী চিরনিদ্রার মাঝে কখন যে নীরব হ'য়ে যায় তার ঠিক নেই,—সুখ, যৌবন, সৌন্দর্য্য, গান, গন্ধ, আলো—সবই নিমেষে নিমেষে বলছে যাই, যাই। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের বুকে অজানার পিছনে আমরা ছুটাছুটি করতে ভালোবাসি নে। আমরা যখন কোন কিছুর মধ্যে আমাদের অন্তরের যথার্থ তৃপ্তি খুঁজে পাই তখন তাকেই আমরা দুবাহু দিয়ে আঁকড়ে ধরি—যেমন ক'রে মেঘাচ্ছন্ন ঝড়ের রাতে মা

তার শিশুকে আঁকড়ে ধরে। দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কারের জন্য অথবা হিমালয়ের চূড়ায় আরোহণ করবার নিমিত্ত আমাদের কিছুমাত্র উৎসাহ নেই। কোন নারী পরস্ত্রী ব'লেই নিজের স্ত্রীর চেয়ে সুন্দরী হবে—এরকম ধারণাকে আমরা মনের মধ্যে স্থান দিই নে এবং সেই জন্যই স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার করায় আমাদের এত আনন্দ। দুনিয়ার হাটে আমাদের কোনো তাড়াহুড়া নেই। পৃথিবীতে রক্ত-সাগরের মধ্যে কত জীর্ণ সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে, কোটী কোটী নরনারীর হাহাকারের মধ্যে কত নূতন সাম্রাজ্য জেগে উঠ্ছে—সে সব নিয়ে আমরা মাথা ঘামানো প্রয়োজন মনে করি নে। চারিদিকের কর্ণ-বিদারী রণহুঙ্কারের মধ্যে আমাদের পল্লীর জীবন-প্রবাহ শান্ত ছন্দে বয়ে চলেছে। নদীতে খেয়া নৌকা প্রতিদিন পারাপার করছে, কেউ ঘরে চলেছে, কেউ ঘর থেকে আসছে, কাদা-খোঁচা পাখী লেজ দুলিয়ে দুলিয়ে জলের ধারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সানাইয়ের সুরের মধ্যে টোপর-পরা বর চেলী-পরা বধূকে নিয়ে ঘরে ফিরছে, সূর্য্যাস্তের ম্লান আলোকে মাঠ থেকে আমনধান্য নিয়ে চাষী ফিরে যাচ্ছে গ্রামের পানে। আমাদের জীবন-যাত্রার এই স্বচ্ছন্দগতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'খেয়া' কবিতায় লিখেছিলেন,—

খেয়া নৌকা পারাপার করে নদী স্রোতে,
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হোতে।
দুই তীরে দুই গ্রাম আছে জানা শোনা,
সকাল হইতে সন্ধ্যা করে আনাগোনা।

পৃথিবীতে কত দ্বন্দ্ব কত সর্ব্বনাশ,
নূতন নূতন কত গড়ে ইতিহাস ;
রক্তপ্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া উঠে'
সোনার মুকুট কত ফুটে আর টুটে।
সভ্যতার নব নব কত তৃষ্ণা ক্ষুধা,
উঠে কত হলাহল, উঠে কত সুধা।
শুধু হেথা দুই তীরে—কেবা জানে নাম—
দোঁহাপানে চেয়ে আছে দুইখানি গ্রাম।
এই খেয়া চিরদিন চলে নদীস্রোতে,
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হোতে।

এই হোলো আসল বাংলার রূপ। এই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে যদি বলি খাঁটি বাঙালী তবে কিছু মাত্র ভুল হবে না। খাঁটি বাঙালী ব'লেই জীবনের সহজ সরল আনন্দগুলিকে সমস্ত সত্তা দিয়ে এমন ক'রে তিনি উপভোগ করতে পেরেছেন, খাঁটি বাঙালী ব'লেই বাঙলা দেশের আকাশ-বাতাস তাঁর প্রাণে এমন ক'রে বাঁশি বাজিয়েছে, পদ্মা তাঁর মনকে এমন ক'রে চুরি ক'রেছে, তাঁর অজস্র কবিতায় এবং গদ্য-রচনায় বাংলা দেশের পল্লীর দৃশ্যগুলি এমন জীবন্ত হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে।

দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্ব্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি—সেই সন্ধ্যাস্নান,

সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান,
নীবার ধান্যের মুষ্টি, বল্কল বসন,
মগ্ন হ'য়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি। পাষাণপিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব ;
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,
পরাণে স্পর্শিতে চাই—ছিঁড়িয়া বন্ধন
অনন্ত এ জগতের হৃদয় স্পন্দন।

বর্ত্তমান সভ্যতার সুপ্রচুর আড়ম্বর ও চাকচিক্যের প্রতি এই যে বিতৃষ্ণা, পল্লীর শান্ত সরল জীবনের মধ্যে ফিরে যাবার জন্য এই যে সুগভীর আকাঙ্ক্ষা, এখানে রবীন্দ্রনাথ খাঁটি বাঙালী ছাড়া আর কিছুই নন। এত যে আমাদের বেদনার দুর্ব্বহ বোঝা, এত যে আমাদের পরাধীনতার দুঃসহ গ্লানি, তবুও আকাশে যখন পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে—আমরা জানালা খুলে দিই ; গাছের পাতার চালুনীতে ছাঁকা হ'য়ে সেই চাঁদের আলো যখন ঘাসের উপরে ছায়ার সঙ্গে খেলা করে—আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখি ; দোয়েলের গান শুনে আমাদের হৃদয় জুড়িয়ে যায় এবং নদীর ধারে কাশ ফুলের শোভা দেখলে আমরা মনে অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি অনুভব করি।

এইবার রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে কতকগুলি পল্লী-চিত্র আমরা পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দেবো—যা দেখলে তাঁরা অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারবেন, পল্লীর সঙ্গে কবির হৃদয়ের যোগ

কত গভীর, কত নিবিড়। চৈতালিতে 'মধ্যাহ্ন' ব'লে একটি কবিতা আছে। এই সুন্দর কবিতাটিতে পল্লীর একটি চিত্র ফটোগ্রাফের মত নিখুঁত হয়ে ফুটে উঠেছে।

বেলা দ্বিপ্রহর।
ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জ্জর
স্থির স্রোতোহীন। অর্দ্ধমগ্ন তরীপরে
মাছরাঙা বসি, তীরে দুটী গরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্ত নেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবি। নদীকূলে
জনহীন নৌকা বাঁধা। শূন্য ঘাট তলে
রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্নান করে জলে
পাখা ঝট্‌পটি। শ্যাম শষ্পতটে তীরে
খঞ্জন দুলায়ে পুচ্ছ নৃত্য করি' ফিরে।
চিত্রবর্ণ পতঙ্গম স্বচ্ছ পক্ষভরে
আকাশে ভাসিয়া উড়ে, শৈবালের পরে
ক্ষণে ক্ষণে লভিয়া বিশ্রাম। রাজহাঁস
অদূরে গ্রামের ঘাটে তুলি কলভাষ
শুভ্র পক্ষ ধৌত করে সিক্ত চঞ্চুপুটে।
শুষ্ক তৃণগন্ধ বহি ধেয়ে আসে ছুটে
তপ্ত সমীরণ—চলে যায় বহুদূর।
থেকে থেকে ডেকে ওঠে গ্রামের কুকুর
কলহে মাতিয়া। কভু শান্ত হাম্বাস্বর,
কভু শালিকের ডাক, কখনো মর্ম্মর

জীর্ণ অশথের, কভু দূর শূন্য পরে
চিলের সুতীব্রধ্বনি, কভু বায়ুভরে
আর্ত্তশব্দ বাঁধা তরণীর, মধ্যাহ্নের
অব্যক্ত করুণ একতান, অরণ্যের
স্নিগ্ধছায়া, গ্রামের সুষুপ্ত শান্তিরাশি,
মাঝখানে ব'সে আছি আমি পরবাসী।
প্রবাস বিরহ দুঃখ মনে নাহি বাজে,
আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে ;

একদা রবীন্দ্রনাথের চিত্ত এই বাংলাদেশের পল্লীগুলির মাঝে তাদের বিচিত্ররূপ, বিচিত্রসুর, বিচিত্রগন্ধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত হ'য়ে ছিলো। পল্লীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সেদিন কত যে নিবিড় ছিলো তারই পরিচয় পাবো উপরের কবিতায়। বাংলাদেশের দ্বিপ্রহরের একটি শান্ত নদীতীর, তার অর্দ্ধমগ্ন তরীর উপরে উপবিষ্ট মাছরাঙা পাখী, তার স্নানরত দাঁড়কাকের পাখার ঝট্‌পটি, তার রাজহাঁসের কলভাষ, চিলের সুতীব্র ধ্বনি, খঞ্জনের নৃত্য, শালিকের ডাক, কুকুরের চীৎকার, গোরুর হাম্বাস্বর, অশথের মর্ম্মর, শুষ্কতৃণের গন্ধ, তপ্ত সমীরণের স্পর্শ, বাঁধা তরণীর আর্ত্তশব্দ এবং অরণ্যের স্নিগ্ধচ্ছায়া নিয়ে আর কার কবিতায় এমন জীবন্ত হ'য়ে দেখা দিয়েছে? রবীন্দ্রনাথের চোখ—চিত্রকরের চোখ ; সে চোখের দৃষ্টির সামনে একবার যা ধরা দেয়, মনের মধ্যে তার ছবি আঁকা হ'য়ে থাকে।

'কল্পনা'য় 'বঙ্গলক্ষ্মী' বলে যে কবিতাটি আছে, তার মধ্যেও বাংলার পল্লীজননীর একটি অনুপম রূপ ফুটে উঠেছে। এখানে ঐ কবিতাটি থেকে কয়েকটি লাইন পাঠকপাঠিকাদের কাছে উপস্থিত করবো। এই লাইন কয়েকটি পাঠ ক'রে তাঁরা অনায়াসে বুঝতে পারবেন,—রবীন্দ্রনাথ পল্লীকে অবসর মত ভালোবাসেন নি। বঙ্গের পল্লীলক্ষ্মী অতুলনীয় মাধুর্য্য নিয়ে তাঁর মুগ্ধ নয়ন-সম্মুখে প্রতিভাত হয়েছে আর সেই অবর্ণনীয় মাধুর্য্যের পানে চেয়ে চেয়ে কবির চোখদুটি ভাবাবেশে অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে।

মধ্যাহ্নে পল্লবাঞ্চল প্রসারিয়া ধরি
রৌদ্র নিবারিছ,—যবে আসে বিভাবরী
চারিদিক হ'তে তব যত নদনদী
ঘুম পাড়াইবার গান গাহে নিরবধি
ঘেরি ক্লান্ত গ্রামগুলি শতবাহুপাশে।
শরৎমধ্যাহ্নে আজি স্বল্প অবকাশে
ক্ষণিক বিরাম দিয়া পুণ্য গৃহকাজে
হিল্লোলিত হৈমন্তিকমঞ্জরীর মাঝে
কপোতকূজনাকুল নিস্তব্ধ প্রহরে
বসিয়া রয়েছো মাতঃ, প্রফুল্ল অধরে
বাক্যহীন প্রসন্নতা ; স্নিগ্ধ আঁখিদ্বয়
ধৈর্য্যশান্ত দৃষ্টিপাতে চতুর্দ্দিকময়
ক্ষমাপূর্ণ আশীর্ব্বাদ করে বিকীরণ।
হেরি সেই স্নেহপ্লুত আত্মবিস্মরণ,

মধুরমঙ্গলচ্ছবি মৌন অবিচল,
নতশির কবিচক্ষে ভরি আসে জল।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্গলক্ষ্মীর এর চেয়ে মধুরতর ছবির সঙ্গে আজ পর্য্যন্ত আমার পরিচয় ঘটেনি। আর কোন দেশের আর কোন কবি তাঁর জন্মভূমির মাধুর্য্যকে এর চেয়ে প্রাণস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করেছেন কি না, তাও আমার জানা নেই।

মাতার কণ্ঠে শেফালি মাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী।
পরেছে কিরীট কনক কিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে,
কুসুম-ভূষণ জড়িত চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী।
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী।

শারদ প্রভাতে বঙ্গ-জননী যে অপরূপ মহিমায় মণ্ডিত হ'য়ে বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অন্তরে আনন্দের হিল্লোল জাগায়, তার এমন ছবি বাংলা সাহিত্যে কি সত্য সত্যই সুদুর্লভ নয়?

(৪)

যে সাহিত্যের কাজ কল্পনাকে নিয়ে কেবল বিলাস করা, তার মূল্য খুব বেশী নয়। কালের ললাটে সেই সাহিত্যই কোহিনুরের মত দীপ্তি পায়—যা প্রাণের সঙ্গে প্রাণকে মিলিয়ে দেয়, হৃদয়কে হৃদয়ের নিকটে আনে, মানুষকে মানুষের আত্মীয় করে। ভিক্টর হুগোর সাহিত্য অমরত্বের দাবী করতে পারে—কারণ তাঁর 'লা মিজারেবল্‌স্' প'ড়ে চোরকেও আমরা ভায়ের মত ভালোবাসতে শিখি, পতিতার মধ্যেও মনুষ্যত্বের জ্যোতিকে আমরা অবলোকন করি। হুগোর লেখা মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। ঠিক এই জন্যই কি ডসটয়েভস্কির বইগুলি বিশ্বের শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করেনি ? Crime and Punishmentএর নায়ক রাসকলনিকফ যেখানে বারবনিতা সোনিয়ার কাছে নতজানু হ'য়ে বল্‌ছে, I bow down to thee, thou suffering humanity—সেখানে নিখিলের সমস্ত হতভাগিনীদের মর্ম্মবেদনাকে আমরা কি হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি না ? টমাস হার্ডির Tess of the D'Urbervilles এর নায়িকার এবং Jude, the Obcsureএর নায়কের অশ্রুসিক্ত জীবনের গভীর ট্রাজেডি অগণিত দুর্ভাগ্য নরনারীর প্রতি আমাদের চিত্তে কি সমবেদনার সঞ্চার করে না ? টলষ্টয়ের Resurrection প'ড়ে রাস্তার পতিতা দেখলে ঘৃণায়

নাসিকা কুঞ্চিত করা অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। আলেকজাণ্ডার কুপ্রিনের Yama the Pitও জগতের চরিত্রহীনাদের প্রতি আমাদের চিত্তে অপরিসীম সমবেদনার উদ্রেক করে। ওয়াল্ট হুইটম্যানের Leaves of Grass আমাদের চোখের সামনে একটা নূতন জগতের তোরণদ্বার খুলে দেয় আর সেই নূতন জগতে প্রবেশ ক'রে আমরা পৃথিবীর অখ্যাতনামা সাধারণ নরনারীর মধ্যে মনুষ্যত্বের অনির্ব্বচনীয় গরিমাকে আবিষ্কার করি। ভিক্টর হুগো, ডসটয়েভস্কি, টমাস হার্ডি, টলষ্টয়, ওয়াল্ট হুইটম্যান, আলেকজাণ্ডার কুপ্রিন প্রমুখ প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের রচনা মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার যোগকে নিবিড়তর করে, আমাদের চেতনাকে দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত ক'রে দেয়—এই জন্যই বিশ্বসাহিত্যের দরবারে তাদের গৌরব এত বেশী। গোর্কির উপন্যাসগুলি পৃথিবীর সমস্ত জাতির কাছে আজ এত সম্মান পাচ্ছে—তারও কারণ, তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে নিখিলের সর্ব্বহারাদের অবর্ণনীয় বেদনাকে আমরা নিজের বেদনা ব'লে উপলব্ধি করতে পারি।

ঠিক যে কারণে টলষ্টয় আর ডসটয়েভস্কি, গোর্কি আর কুপ্রিন, হুইটম্যান আর হুগো আমাদের এত প্রিয়, ঠিক সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যেও আমাদের চিত্ত এত আনন্দ খুঁজে পায়। তাঁর রচনার শুভ্র আলোক-শিখায় মানুষ মানুষের কাছে আত্মীয়রূপে প্রতিভাত হয়, তাঁর লেখা প'ড়ে আমাদের চারিপাশের নরনারীকে আমরা ভালোবাসতে শিখি, অহমিকার সঙ্কীর্ণ কারাগার থেকে মুক্ত ক'রে উন্মুক্ত আকাশের

তলে মহামানবের মেলায় আমাদের তিনি দাঁড় করিয়ে দেন। তিনি আমাদের চোখের পিচুটি মুছিয়ে দিয়ে দৃষ্টির সামনে নূতন জগত জাগিয়ে তোলেন—আর সেই জগতে আমরা দেখতে পাই, একই প্রাণের বিপুল-প্রবাহ তরঙ্গিত হ'চ্ছে সকলের মধ্যে। কেউ কারও পর নয়।

রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে এই যে গণতন্ত্রের সুর—এর পিছনে ইতিহাস আছে। ঘটনাপ্রবাহে ভাসতে ভাসতে তাঁর জীবনের তরী একদা নদীয়া জেলার শিলাইদহের তীর-প্রান্তে উপনীত হয়েছিল। পল্লীর সঙ্গে তাঁর এই অভাবনীয় যোগ বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অতিশয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা—কারণ এই ঘটনাকে আশ্রয় ক'রে বাঙলাদেশের পল্লীপ্রকৃতিকে এবং পল্লীর জনসাধারণকে নিবিড়ভাবে জানবার তিনি সুযোগ পেয়েছিলেন আর এই অভিজ্ঞতাই আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে অপর্য্যাপ্ত ফসল ফলিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে শিলাইদহের দান সত্যসত্যই অপরিমেয়।

পল্লীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগকে অভাবনীয় বলবার কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে বিলাত গিয়েছিলেন আইন পড়বার জন্য। ব্যারিষ্টার হবার সাধনায় ব্রতী হবার যখন তিনি আয়োজন করছেন, তখন হঠাৎ তাঁর পিতা তাঁকে দেশে ডেকে পাঠালেন। আর ব্যারিষ্টারি পড়া হোলো না। পিতার বিষয়কর্ম্ম দেখবার জন্য দেশেই তিনি থেকে গেলেন। তাঁর কর্ম্মকেন্দ্র হোলো নদীয়ার শিলাইদহ। পদ্মার নিভৃত চরে চরে কাটলো তাঁর জীবনের অনেকগুলি বৎসর। দিনের

পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর পল্লীর মানুষ আর পল্লীর প্রকৃতিকে অনিমেষনয়নে দেখে দেখে কাটিয়ে দিলেন তিনি। এই দৃষ্টিই তো সাহিত্যসৃষ্টির মূলে। ব্যারিষ্টার হবার চেষ্টা বারম্বার কেমন ক'রে ব্যর্থ হ'লো, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, "ব্যারিষ্টার হইব বলিয়া বিলাতে আয়োজন স্থুরু করিয়াছিলাম, এমন সময়ে পিতা আমাকে দেশে ডাকিয়া আনিলেন। আমার কৃতিত্ব লাভের এই সুযোগ ভাঙিয়া যাওয়াতে বন্ধুগণ কেহ কেহ দুঃখিত হইয়া আমাকে পুনরায় বিলাতে পাঠাইবার জন্য পিতাকে অনুরোধ করিলেন। এই অনুরোধের জোরে আবার একবার বিলাতে যাত্রা করিয়া বাহির হইলাম। সঙ্গে আরও একজন আত্মীয় ছিলেন। ব্যারিষ্টার হইয়া আসাটা আমার ভাগ্য এমনি সম্পূর্ণ নামঞ্জুর করিয়া দিলেন যে, বিলাত পর্য্যন্ত পৌঁছিতেও হইল না—বিশেষ কারণে মাদ্রাজের ঘাটে নামিয়া পড়িয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল......যাহা হউক, লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভের জন্য দুইবার যাত্রা করিয়া দুইবারই তাড়া খাইয়া আসিয়াছি। আশা করি, বার লাইব্রেরীর ভূভার বৃদ্ধি না করাতে আইন দেবতা আমাকে সদয়চক্ষে দেখিবেন।"

বার লাইব্রেরীর ভূভার বৃদ্ধি না করার জন্য আইন দেবতা তাঁকে ক্ষমা করেছেন কিনা জানি না, কিন্তু গৌড়জন তাঁকে হৃদয়ের মধ্যে সাদরে বরণ ক'রে নিয়েছে—এতে কোনই সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ ব্যারিষ্টার হ'য়ে দেশে ফিরলে বঙ্গসাহিত্যের কি দশা হোতো, তা কি আমরা ভাবতে পারি?

আইনজীবী হ'লে বীণা ফেলে দিয়ে কেবল আইন গ্রন্থের মধ্যে তিনি মগ্ন হ'য়ে থাকতেন—এমন কথা বলি না। তখনও অবসর সময়ে ব'সে ব'সে তিনি বীণায় ঝঙ্কার তুলতেন, কিন্তু সে ঝঙ্কারের মধ্যে বাঙলাদেশের মাটির সুরটি কি এমন ক'রে জেগে উঠতো? তার মধ্যে বাঙলার অন্তঃপুর-চারিণী নদীগুলির কলধ্বনি কি এমন ক'রে ধরা পড়ত? ব্যারিষ্টার রবীন্দ্রনাথ যে সাহিত্য রচনা করতেন, তার মধ্যে বাঙলার প্রকৃতি আর সেই প্রকৃতির পটভূমিতে বাঙলার সাধারণ পল্লীবাসীর সুখদুঃখের ছোট ছোট কাহিনীগুলি কখনও এমন নিখুঁত রূপ নিয়ে ফুটে উঠতে পারতো না। শহুরে আবহাওয়ায় কৃত্রিম পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে অধিকাংশ সময় যাপন ক'রে সাহিত্যের দর্পণে দেশের পল্লী-জীবনকে নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত করা অসম্ভব। দেশের সত্যিকারের চেহারাকে সাহিত্যে রূপ দিতে হ'লে, দেশের মর্ম্মমূলে সাহিত্য-সাধনার শিকড়কে প্রবেশ করিয়ে দেবার প্রয়োজন আছে। দেশের জনসাধারণের জীবনধারাকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পর্য্যবেক্ষণ করা চাই। দেশের নদী, বন, প্রান্তরের সঙ্গে এক হ'য়ে না গেলে সাহিত্য কখনো জাতীয় সাহিত্যের সম্মান দাবী করতে পারে না। বাঙলা সাহিত্য একদিন বিশ্বসাহিত্যের দরবারে গৌরবের আসন অধিকার করবে, বঙ্গবাণীর বীণার ঝঙ্কার একদিন সাত সমুদ্রের তীরে তীরে প্রতিধ্বনি তুলবে, বাঙ্গালীর সাহিত্যে গণতন্ত্রের সুর একদিন ধ্বনিত হ'য়ে উঠবে—তাই, বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথকে তাঁর

ভাগ্যবিধাতা বারলাইব্রেরীর দ্বারপ্রান্ত থেকে নিয়ে গেলেন গ্রামের নিভৃত বক্ষে। তাঁকে দেখালেন বাঙলার বিচিত্র পল্লীরূপ, পল্লীর অখ্যাতনামা নরনারীদের জীবনের অন্তঃপুরের সঙ্গে ঘটালেন তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। পল্লীর সঙ্গে কবির পরিচয়ের এই ঘনিষ্ঠতা বাঙলার সাহিত্যে ফলিয়েছে অপর্য্যাপ্ত সোনালি ফসল, তার মধ্যে নিয়ে এসেছে গণতন্ত্রের উদার সুর। রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লী-চিত্রগুলির মধ্যে গণতন্ত্রের যে সুর জেগে উঠেছে—বর্ত্তমান প্রবন্ধে তারই একটু আধটু পরিচয় দেবো। ইতিপূর্ব্বে রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে পল্লীর যে চিত্রগুলি পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছে, তার মধ্যে পল্লীর প্রকৃতির দিকটাই বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এইবার রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লীর সাধারণ মানুষের যে ছবি ফুটে উঠেছে—তারই পরিচয় দিতে চাই।

'পণরক্ষা' গল্পটীতে তন্তুবায় বংশীবদন এবং তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রসিককে কেন্দ্র ক'রে যে করুণ আখ্যায়িকাটী গ'ড়ে উঠেছে—তার মধ্যে বাঙলার পল্লীজীবনের একটী নিখুঁত ছবিরই কি আমরা পরিচয় পাই না? গল্প পড়তে পড়তে ছবির পর ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে, আর সেই সব ছবির মধ্য দিয়ে আমরা একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের গভীর পল্লী-প্রীতির পরিচয় পাই, আর একদিকে তেমনি পল্লীর সাধারণ মানুষকে শ্রদ্ধা করতে এবং ভালোবাসতে শিখি। বংশী নিজের সুখ-দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে রসিকের সুখের জন্য তিলে তিলে আত্মদান করছে—গায়ে তার

শীতবস্ত্র জীর্ণ হ'য়ে গেছে, শরীর তার রোগে শীর্ণ—তবুও রোগতপ্ত দেহ নিয়ে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সে মিট্‌মিটে প্রদীপে তাঁত বুনে চলেছে কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহের পণের টাকা ও তার বাইসিকেল কেনার অর্থ সংগ্রহ করবার জন্য,—রসিক যখন রাগ ক'রে চলে গেল, তখনও তার জন্য বংশীর পরিশ্রমের বিরাম নেই। এমন একখানি উদার ভ্রাতৃস্নেহের ছবি আমাদের গল্প-সাহিত্যে বিরল। এর নামই হোলো সত্যিকারের গণ-সাহিত্য এবং এই রকমের গণ-সাহিত্যের মধ্য দিয়েই মানুষের সঙ্গে মানুষের গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই রকম সাহিত্য প'ড়েই আমাদের চারিদিকের অখ্যাতনামা জনসাধারণের চরিত্রের মহিমাকে আমরা উপলব্ধি করতে শিখি আর এই উপলব্ধির দ্বারাই আমাদের চিত্ত প্রসার লাভ করে।

'পণরক্ষা' গল্পটীর মধ্যে পল্লীর যে ছবিগুলি ফুটে উঠেছে—এখানে তাদের কিছু কিছু পরিচয় দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

"শীতের মধ্যাহ্ন নিস্তব্ধ, ভাঙা উঁচু পাড়ির উপর শালিক নাচিতেছে, পশ্চাতের আমবাগানে ঘুঘু ডাকিতেছে এবং জলের কিনারায় শৈবালের উপর একটী পতঙ্গ তাহার স্বচ্ছ দীর্ঘ দুই পাখা মেলিয়া স্থিরভাবে রৌদ্র পোহাইতেছে।" চন্দনদহের এই বর্ণনার মধ্যে ফুটে উঠেছে পল্লী-প্রকৃতির একটী নিখুঁত চিত্র।

"একখানি বোঝাইশূন্য গরুর গাড়ীতে গাড়োয়ান র‍্যাপার মুড়ি দিয়া নিদ্রামগ্ন; গরু দুটি আপন মনে ধীরে ধীরে

বিশ্রামশালার দিকে গাড়ী টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। গ্রামের গোয়ালঘর হইতে খড়জ্বালানো ধোঁয়া বায়ুহীন শীতরাত্রে হিমভারাক্রান্ত হইয়া স্তরে স্তরে বাঁশঝাড়ের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে।” বাঙলাদেশে শীতের রাত্রে গ্রামের ছবি কি এই রকমের নয়?

কলিকাতায় তাঁতের স্কুলের শিক্ষক রসিক যেখানে মনশ্চক্ষে গ্রামের ছবি দেখছে, সেখানেও পল্লীর বর্ণনাটী কি সুন্দর। রসিক দেখছে, “পুরোহিতের আধপাগলা ছেলেটা; তাহাদের প্রতিবেশীর কপিলবর্ণের বাছুরটা; নদীর পথে যাইতে রাস্তার দক্ষিণধারে একটা তালগাছকে শিকড় দিয়া আটিয়া জড়াইয়া একটা অশ্বত্থ গাছ দুই কুস্তিগির পালোয়ানের মত প্যাঁচ কষিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই তলায় একটা অনেকদিনের পরিত্যক্ত ভিটা, তাহাদের বিলের তিনদিকে আমন ধান, একপাশে গভীর জলের প্রান্তে মাছধরা জাল বাঁধিবার জন্য বাঁশের খোঁটা পোঁতা, তাহারই উপরে একটা মাছরাঙা চুপ করিয়া বসিয়া; কৈবর্ত্তপাড়া হইতে সন্ধ্যার পরে মাঠ পার হইয়া কীর্ত্তনের শব্দ আসিতেছে; ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নানা প্রকারের মিশ্রিত গন্ধে গ্রামের ছায়াময় পথে স্তব্ধ হাওয়া ভরিয়া রহিয়াছে। আর তারই সঙ্গে মিলিয়া তাহার সেই ভক্ত বন্ধুর দল, সেই চঞ্চল গোপাল, সেই আঁচলের খুঁটে পান বাঁধা বড় বড় স্নিগ্ধ চোখ-মেলা সৌরভী; এই সমস্ত স্মৃতি ছবিতে গন্ধে শব্দে স্নেহে প্রীতিতে বেদনায় তাহার মনকে প্রতিদিন গভীর আবিষ্ট করিয়া ধরিতে লাগিল।”

পল্লীর প্রতি এই যে গভীর অনুরাগ—এ অনুরাগ কি শুধুই রসিকের ? রবীন্দ্রনাথের নয় ?

"তখন মাঘের শেষ। শর্ষে এবং তিসির ক্ষেতে ফল ধরিতেছে, আখের গুড় জ্বাল দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে, তাহারই গন্ধে বাতাস যেন ঘন হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামের ঘরে ঘরে গোলাভরা ধান এবং কলাই; গোয়ালের প্রাঙ্গণে খড়ের গাদা স্তূপাকার। ওপারে নদীর চরে বাথানে রাখালেরা গরুমহিষের দল লইয়া কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতেছে। খেয়াঘাটের কাজ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নদীর জল কমিয়া গিয়া—লোকেরা কাপড় গুটাইয়া হাঁটিয়া পার হইতে আরম্ভ করিয়াছে।" বাঙলা দেশে শীতকালে নদীর তীরে গ্রামের এই যে দৃশ্য বৎসরে বৎসরে চোখের সামনে জেগে ওঠে—তার এমন নিখুঁত প্রাঞ্জল বর্ণনা আমাদের সাহিত্যে কি বিরল নয় ? তবুও কি শুনতে হবে রবীন্দ্রনাথ শহুরে কবি, পল্লীর কবি নন ?

এই পল্লী-প্রকৃতির পটভূমিতে গ্রাম্যবালিকা সৌরভীর ছবিটিও কি বাণীকণ্ঠের মূক কন্যা সুভার মতই আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে না ? সুভার পাশে ছিপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে গোঁসাইদের অকর্ম্মণ্য ছেলে প্রতাপ, আর সৌরভীর পাশে ছিপ হাতে চন্দনীদহের তীরে দাঁড়িয়ে আছে বংশীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রসিক। রসিক যেমন সৌরভীর কাছে পাণ চায়, প্রতাপও তেমনি সুভার কাছে পাণের কাঙাল। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের মধ্যে সুভা, সৌরভী, মৃণ্ময়ী প্রমুখ গ্রাম্য বালিকাগুলির ছবি এমন সহজ সৌন্দর্য্য নিয়ে ফুটে

উঠেছে, যার তুলনা নেই। তাদের জীবনের মৌন বেদনাকে তিনি যেমন ক'রে ভাষা দিয়েছেন, এমন ক'রে তাদের বেদনাকে আর কে রূপ দিয়েছে? সহানুভূতি কতখানি ব্যাপক, চারিদিকের সকলের সঙ্গে নিজের ঐক্যবোধ কতখানি গভীর, দৃষ্টি কতখানি স্বচ্ছ এবং কল্পনা কতখানি সুদূরপ্রসারী হ'লে পল্লী-জীবনের এমন সব নিখুঁত ছবি আঁকা সম্ভব হয়—সে কথা বলা কি বাহুল্য নয়?

গল্পগুচ্ছের মধ্যে 'ছুটী' ব'লে যে গল্পটি আছে তার নায়ক ফটিক একটি গ্রাম্য বালক। এই গ্রাম্য বালকের প্রবাস-জীবনের বেদনাকে রূপ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এমন একটি ছবি এঁকেছেন যার তুলনা বিরল। মাসীর অনাদর এবং শহরের পাষাণ-কারার বন্ধনের মধ্যে পাড়াগাঁয়ের তেরো বৎসরের বালক যে অপরিসীম মর্ম্মবেদনা অনুভব ক'রে অবশেষে অকালে ঝ'রে গেল, সেই বেদনার মধ্যে পৃথিবীর শতশত অনাদৃত বালকের মৌন বেদনাকেই তিনি ভাষা দিয়েছেন। পল্লীর অবারিত মাঠের জন্য, গ্রামের নদীর তীরে মুক্তির মধ্যে ছুটাছুটি ক'রে বেড়ানোর নিমিত্ত শহরের পিঞ্জরে আবদ্ধ পল্লী বালকেরা যে কত দুঃখ অন্তরের মধ্যে অনুভব করে—রবীন্দ্রনাথ ছাড়া পাড়াগাঁয়ের ছেলের সে অবর্ণনীয় দুঃখকে এমন ক'রে আর কে ভাষা দিতে পারতো?

'ছুটি' গল্পে যেমন পল্লীবালক ফটিকের বেদনা মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে, 'সমাপ্তি' গল্পে শ্বশুরবাড়ীর পিঞ্জরে আবদ্ধ পল্লীর বালিকাবধূ 'মৃন্ময়ী'র বেদনাও কি তেমনি ক'রেই মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠেনি? পৃথিবীতে উপেক্ষিত যারা, অনাদৃত যারা—তারা

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে জুড়ে আছে। সেখানে অপূর্ব্বর বালিকাবধূ মৃন্ময়ী শ্বশুরবাড়ীর রুদ্ধ ঘরে গুমরে গুমরে কাঁদছে, "বাবা আমাকে তুমি নিয়ে যাও। এখানে আমার কেউ নেই। এখানে থাকলে আমি বাঁচবো না।" সেখানে বালক ফটিক মামা বিশ্বম্ভরবাবুর কলিকাতার বাসায় মামীর অনাদরের মধ্যে নিয়ত দীর্ঘশ্বাস ফেলছে গ্রামের বুকে মাতৃস্নেহের মাঝে ফিরে যাওয়ার জন্য, আর সেই দীর্ঘশ্বাস পাঠকের চক্ষু দুটিকে অশ্রুজলে ভরিয়ে তোলে। সেখানে নির্জ্জন দ্বিপ্রহরের মত শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন বোবা মেয়ে সুভা কলিকাতায় যাওয়ার পূর্ব্বে চিরপরিচিত নদীতটে শষ্পশয্যায় লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদে, "তুমি আমাকে যাইতে দিও না, মা, আমার মত দুটি বাহু বাড়াইয়া তুমিও আমাকে ধরিয়া রাখো।" সেখানে দীপহীন কুটীরপ্রান্তে হতাশ্বাস ভীত হৃদয় নিয়ে অছিমদ্দিনের বিধবা মাতা মির্জ্জাবিবি কারারুদ্ধ পুত্রের জন্য নিঃশব্দে অশ্রুমোচন করে।

বাঙলাদেশের জনসাধারণের সুখ-দুঃখের সঙ্গে পরিচিত হ'তে গেলে রবীন্দ্রনাথকে ভালো ক'রে অধ্যয়ন করবার একান্ত প্রয়োজন আছে। বাঙলা দেশের পল্লীর প্রকৃতি ও মানুষের ছবি তাঁর সাহিত্যে যে রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে, তার সত্য সত্যই তুলনা নেই। তাঁর সাহিত্য চিরদিন বেঁচে থাকবে —কারণ সেই সাহিত্যের মূল রয়েছে জনসাধারণের জীবনের মধ্যে, বাঙলাদেশের মাটীর অভ্যন্তরে। তাঁর সাহিত্য অমর হ'য়ে থাকবে, কারণ তিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার পথকে প্রশস্ত করেছেন।

(৫)

সৌন্দর্য্যকে, মাধুর্য্যকে, শৌর্য্যকে আবিষ্কার করবার জন্য দূরে যাওয়ার কি একান্তই প্রয়োজন আছে? যা কাছের তাকে আমরা এমন ক'রে অবহেলা করি কেন? যারা নিকটের মানুষ তাদের মধ্যেও কি লুকিয়ে নেই চরিত্রের গরিমা, মনুষ্যত্বের মহিমা, ভালোবাসার নিষ্কলঙ্ক দীপ্তি? দূরের প্রতি আমাদের কেমন যেন একটা মোহ আছে। এই মোহের জন্যই আমরা বর্ত্তমানকে তুচ্ছ ক'রে ভবিষ্যতকে অযথা মূল্য দান করি, এই মোহের জন্যই আমরা চারিপাশের নিকটতম মানুষ-গুলিকে বিস্মৃত হ'য়ে সাহিত্য-সৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করি পৌরাণিক কাহিনী থেকে আর রাজপুতানার ও মহারাষ্ট্রের ইতিহাস থাকে।

সুখের কথা, এ মোহ আমাদের ভাঙতে আরম্ভ করেছে। আমরা এখন উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছি, যা আমাদের অতি পরিচিত, তার মত মধুর আর নেই কিছু। আনন্দ, জ্ঞান এইখানে—অন্যত্র নয়; সুখ রয়েছে এই মুহূর্ত্তের বুকে—সুখের জন্য ভবিষ্যতের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার মানে হয় না কোনো। এ চেতনাও আমাদের মনের মধ্যে জাগতে সুরু হয়েছে, সকালবেলা ঘুম ভেঙে যাদের উপরে প্রথম আমাদের দৃষ্টি পড়ে, তাদের উপেক্ষা করবার মত ভ্রান্তি আর নেই কিছু।

যারা আমাদের বন্ধু, সহোদর, নিকটতম প্রতিবেশী তাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের মহিমাকে আবিষ্কার করবার মত দৃষ্টি নেই যাদের, তারাই তো সত্যিকারের অন্ধ। যারা আমাদের জননী, ভগ্নী, জায়া—তাদের মধ্যে যারা দেখতে শেখেনি স্বর্গের জ্যোতিকে, আসল দৃষ্টিহীন তো তারাই।

দূরের মোহকে জয় ক'রে নিকটের মহিমাকে যাঁরা রূপ দিয়েছেন বঙ্গসাহিত্যে—তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে একজন অগ্রদূত ব'লে নিঃসংশয়ে আমরা অভিনন্দিত করতে পারি। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রকেও আমরা একজন অগ্রণী বলে অভিনন্দিত করতে পারি, কারণ যারা আমাদের নিতান্ত কাছের মানুষ তাদেরই কাছে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে শরৎসাহিত্য বাঙালীর কাছে এত বরণীয় হয়েছে। এই ফ্যাশনের যুগে ছুটি পেলেই সৌন্দর্য্যকে উপভোগ করবার জন্য আমরা ছুটে যাই ওয়ালটেয়ারের সমুদ্রতীরে, নয়তো দার্জ্জিলিংএর গিরি-শিখরে। প্রকৃতির মাধুর্য্য বলতেই আমাদের কল্পনা দৌড় দেয় সুইজার্ল্যাণ্ডের পর্ব্বতবেষ্টিত হ্রদের ধারে, নয়তো কাশ্মীরের ভূস্বর্গে। এই সোনার বাঙলার নদী-বন-প্রান্তরে প্রকৃতি দুহাতে যে সৌন্দর্য্য ছড়িয়ে দিয়েছে—আমাদের দৃষ্টিতে তার মূল্য অল্পই, কারণ তার সঙ্গে বাল্য থেকেই আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ। সহজে আমরা যা পাই, তার মূল্য সহজে উপলব্ধি করা আমাদের স্বভাবগত নয়। গেঁয়ো যোগী যে কারণে ভিখ পায় না, সেই কারণেই যা নিকটের তাকে আমরা অবহেলা ক'রে থাকি।

কবির দৃষ্টি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন যাঁরা, কেবল তাঁদেরই মধ্যে আমরা এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখতে পাই। শুধু তাঁদেরই দৃষ্টিতে তুচ্ছ ব'লে নেই কিছু পৃথিবীতে। যেখানে যেখানে সেই দৃষ্টি পড়ে, সেখানে সেখানেই জেগে ওঠে সৌন্দর্য্যের শতদল। মাধুর্য্যকে সর্ব্বত্র উপলব্ধি করবার এই যে প্রতিভা—এই প্রতিভাই তো কবিদের জন্য উন্মুক্ত রেখেছে নিখিলের সমস্ত প্রবেশদ্বার। সব ঋতুই তাঁদের কাছে বহন ক'রে আনে আনন্দের অমৃত। তাঁরা পুরুষের যেমন আত্মীয়, নারীরও তেমনি আত্মীয়। অট্টালিকা আর কুটির—সর্ব্বত্রই তাঁদের অবারিত দ্বার! শহর আর গ্রাম—সকলের সঙ্গেই তাঁদের আত্মীয়তার বন্ধন। তরুণ তাঁদের মধ্যে দেখে তারুণ্যের দীপ্তি, প্রবীণ তাঁদের মধ্যে দেখে জ্ঞানের অতলস্পর্শ গভীরতা। সৈনিক তাঁদের গ্রহণ করে সৈনিক ব'লে, শ্রমিক তাঁদের মধ্যে দেখে দরিদ্রের অকৃত্রিম সখা। মুসলমান তাঁদের মনে করে মুসলমান, হিন্দু মনে করে হিন্দু, ব্রাহ্ম মনে করে ব্রাহ্ম, ইংরেজ মনে করে ইংরেজ, জার্ম্মান মনে করে জার্ম্মান। তাঁদের ভাই-বোন সব জাতির মধ্যে—তাঁদের বন্ধু সব সম্প্রদায়ের বুকে। শেলী আর টলষ্টয়, এমার্সন আর বার্ণার্ড শ—এঁদের আমরা কোন্ সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে ফেলবো? সেকস্পীয়ারের আর ব্রাউনিংএর বন্ধু নেই কোন্ জাতির মধ্যে?

জগতের শ্রেষ্ঠ কবি ব'লে যাঁরা ইতিহাসে পূজা পেয়ে আসছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই অন্যতম। এই কথাটী মনে

রাখলে আমরা সহজেই বুঝতে পারবো—কেন তাঁর সাহিত্যে গণতন্ত্রের শঙ্খ এমন ক'রে বেজে উঠেছে, কেন পল্লীর সৌন্দর্য্য তাঁর গল্পে, কবিতায় এবং অজস্র রচনায় এমন অপূর্ব্ব হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যদি তৃতীয় শ্রেণীর কবি হতেন তবে অবশ্যই তাঁর সহানুভূতির মধ্যে উদারতার অভাব ঘটতো। কিন্তু যে প্রতিভা নিয়ে একজন কালিদাস অথবা একজন সেক্‌সপীয়ার জন্মগ্রহণ করেন সেই প্রতিভারই অগ্নিশিখা রবীন্দ্রনাথে। শ্রেষ্ঠ কবির যা কিছু বৈশিষ্ট্য, রবীন্দ্রনাথও সেই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁর উদার দৃষ্টি এই জন্যই কোনখানে এসে থেমে যায় নি, প্রেমের বিশালতা কোন কিছুকেই অস্বীকার করেনি। তাঁর গল্পের নায়ক-নায়িকা যেমন অট্টালিকা থেকে এসেছে, তেমনি কুটির থেকেও এসেছে। তাঁর লেখার মধ্যে যেমন সহরের চিত্র পাই, তেননি পল্লীর চিত্রও পাই। বিলাত-ফেরত পণ্ডিত এবং গ্রামের অশিক্ষিত চাষী—দুজনেই তাঁর সাহিত্যে গৌরবের স্থান পেয়েছে। তিনি ব্রাহ্মকেও যেমন আঘাত করেছেন, হিন্দুকেও তেমনি আঘাত করেছেন, ব্রাহ্মের মধ্যে যেমন ভালো দেখেছেন, হিন্দুর মধ্যেও তেমনি ভালো দেখেছেন। যারা ঈশ্বর মানে তাদেরও যেমন তিনি বড় করেছেন, যারা ঈশ্বরকে মানে না তাদেরও তেমনি বড় করেছেন। পতিতাকে যেমন কোল দিয়েছেন, সতীকেও তেমনি কোল দিয়েছেন। দেশাত্মবোধের জয়গান তাঁর সাহিত্যে যেমন ক'রে বেজে উঠেছে, আন্তর্জ্জাতিকতার জয়গানও তেমনি ক'রেই তাঁর সাহিত্যে বেজে উঠেছে। কোনো গণ্ডীরই

সঙ্কীর্ণতার মধ্যে তাঁর প্রতিভাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। এই জন্যই জগৎ জুড়ে তাঁর অসংখ্য ভক্তের প্রাচুর্য্য। যারা নারী তারা যেমন রবীন্দ্রনাথকে পরমাত্মীয় ব'লে মনে করে, যারা পুরুষ তারাও তেমনি রবীন্দ্রনাথকে আত্মীয়ের চাইতেও আত্মীয় ব'লে জানে। যারা বিদ্রোহী তরুণ, তারা যেমন পথে চলার প্রেরণা খুঁজে পায় তাঁর সাহিত্যে—যারা শান্ত প্রবীণ, তারাও তেমনি সান্ত্বনা পায় তাঁর লেখায়। পল্লীর লোকে তাঁর রচনায় দেখতে পায় তাদেরই জীবনের ছবি, শহরের লোকে তাঁর লেখার মধ্যে দেখে তাদেরই সুখ-দুঃখের চিত্র। শিখেরা তাঁকে মনে করে শিখ ব'লে, মারাঠার লোকে মনে করে তিনি মারাঠার, রাজপুতেরা মনে করে তিনি রাজপুত। হিন্দুরা তাঁকে মনে করে হিন্দু—ব্রাহ্মরা মনে করে ব্রাহ্ম। যারা শিশু ভোলানাথ, তারা তাঁর লেখা প'ড়ে মনে করে তিনি শিশুদেরই; যারা বৃদ্ধ তারা তাঁর ধর্ম্ম-সঙ্গীত শুনে অশ্রু-মোচন করে। রাশিয়ায় যেমন তাঁর ভক্তের সংখ্যা অগণ্য, চীনেতেও তাই। তিনি সর্ব্বজাতির, সর্ব্বসম্প্রদায়ের, সর্ব্বদেশের এবং সর্ব্বকালের। অনুভূতির এই গভীরতা এবং ব্যাপকতার জন্যই রবীন্দ্র-প্রতিভা একদিকে যেমন কাঞ্চনজঙ্ঘার আলো-ঝলমল শিখরদেশকে আলিঙ্গন ক'রে আছে, আর একদিকে তেমনি মৃত্তিকার প্রতি অণু-পরমাণুকেও আত্মীয়রূপে গ্রহণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় স্বর্গ-মর্ত্ত্য একত্র মিলে গেছে। এই জন্যই যারা তাঁকে শহরের অভিজাত শ্রেণীর বিলাসী কবি ব'লে বিদ্রূপ ক'রে থাকে, তারা সত্যকেই আঘাত করে। অভিজাত-শ্রেণীর

শিক্ষিত নরনারীর জীবনের চিত্র তাঁর সাহিত্যের মুকুরে অবশ্যই প্রতিফলিত হ'য়েছে। মার্জ্জিতরুচি আদব-কায়দা-দুরস্ত শহুরে ভদ্রলোক এবং শহুরে ভদ্রমহিলাকে তিনি সযত্নে তাঁর সাহিত্যে আসন দান করেছেন। কিন্তু নগর-প্রাচীরের প্রান্তে এসে তাঁর কল্পনার ভাণ্ডার ফুরিয়ে যায় নি। সে কল্পনা শহরের সীমাকে অতিক্রম ক'রে, অট্টালিকার সুসজ্জিত কক্ষ এবং উদ্যান-বাটিকাকে পিছনে ফেলে ব্যাপ্ত হয়ে গেছে সেইখানে, যেখানে মরা নদীর বাঁকে দাম জমেছে বিস্তর, বক দাঁড়িয়ে থাকে ধারে, আকাশে উড়ে বেড়ায় শঙ্খচিল, বড়ো বড়ো বাঁশ পুঁতে জাল পেতেছে জেলে, বাঁশের ডগায় বসে আছে মাছরাঙা, পাতিহাঁস ডুবে ডুবে গুগ্‌লি তোলে। তিনি আমাদের চেতনাকে ব্যাপ্ত ক'রে দিয়েছেন তাদের মধ্যে—যারা যাত্রাদলের ছোকরা, পল্লীর অশিক্ষিতা রমণী, যারা সকলের নীচে, সকলের পিছে। গ্রামের কত যে ছবি সুনিপুণ তুলিকায় এঁকেছেন তিনি—তার সংখ্যা নেই। সেই সব ছবির সঙ্গে পাঠক-পাঠিকাদের আগেই কিছু কিছু পরিচয় ক'রে দিয়েছি। এখানে আর একটি ছবি তুলে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। এই ছবিটি বাঙলা দেশের গ্রামের ছবি নয়, পশ্চিমের কোন পল্লীর ছবি।

উত্তর দিকে সিসুগাছের তলা দিয়ে
চলেছে সাদামাটির রাস্তা, উড়ছে ধূলো,
খর রৌদ্রের গায়ে হাল্‌কা উড়নির মতো।

সামনের চরে গম অড়র ফুটি তরমুজের ক্ষেত,
দূরে ঝকমক করছে গঙ্গা,
তার মাঝে মাঝে গুণটানা নৌকা
—কালির আঁচড়ে আঁকা ছবি যেন।
বারান্দায় রূপোর কাঁকন-পরা ভজিয়া
গম ভাঙছে জাঁতায়,
গান গাইছে একঘেয়ে সুরে,
গিরধারী দরোয়ান অনেকখন ধোরে তার পাশে বোসে আছে,
জানি না কিসের ওজরে।
বুড়ো নিমগাছের তলায় ইঁদারা,
গোরু দিয়ে জল টেনে তোলে মালী,
তার কাকুধ্বনিতে মধ্যাহ্ন সকরুণ,
তার জলধারায় চঞ্চল ভুট্টার ক্ষেত।
গরম হাওয়ায় ঝাপসা গন্ধ আসছে আমের বোলের,
খবর আসছে মহা-নিমের মঞ্জরীতে মৌমাছির বসেছে মেলা।

পশ্চিমের পল্লীর এমন নিখুঁত ছবি আর কেউ কি এঁকেছে? পল্লীপ্রকৃতির নিখুঁত বর্ণনায় আমরা রবীন্দ্রনাথের যে বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই, পৃথিবীর অজ্ঞাতনামা অনাদৃত নরনারীদের জীবন-নাট্যকে সাহিত্যে রূপ দেবার বেলায় তিনি সেই একই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। এই বৈশিষ্ট্য হোলো যা কাছের, যা আমাদের অতিপরিচিত, তারই মধ্যে সৌন্দর্য্যকে আবিষ্কার করবার প্রতিভা। বাঙলাদেশের পল্লী-প্রকৃতির

মধ্যে কত যে সৌন্দর্য্য লুকিয়ে আছে—সে সন্ধান দিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের মন ছিলো শূন্য। সেই শূন্যমনে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত করলেন সোনার বাঙলার অনবদ্য মূর্ত্তিখানিকে। শব্দের যাদুকে আশ্রয় ক'রে তিনি আমাদের মনের মধ্যে জাগিয়ে তুললেন বাঙলাদেশের পল্লী-প্রকৃতির চিত্রের পর চিত্র। সে সব চিত্র যেমন জীবন্ত, তেমনি মনোরম। আমরা তাঁর চোখ দিয়ে নূতন ক'রে আবিষ্কার করলাম আমাদের জন্মভূমির অপরূপ ছবিটিকে। পল্লী-প্রকৃতির যে সব সৌন্দর্য্য এতদিন ধ'রে উপেক্ষিত হ'য়ে ছিলো আমাদের চোখে, তাদের ছবিকে রবীন্দ্রনাথ যেমন নব গরিমায় উদ্ভাসিত ক'রে তুললেন, তেমনি ক'রেই তিনি সাহিত্যের দরবারে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে এলেন সেই সব মানুষগুলিকে—যারা অত্যন্ত নিকটের ব'লেই আমাদের কাছ থেকে পেয়ে এসেছে কেবল অনাদরের পর অনাদর।

এই সব অনাদৃত মানুগুলির কারও কারও সঙ্গে পাঠক-পাঠিকাগণের আগেই পরিচয় ঘটেছে। এখানে আরও দুই একজনের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না।

গল্পগুচ্ছের মধ্যে 'আপদ' ব'লে যে আখ্যায়িকাটি আছে, সেখানে আমরা যাত্রার দলের একটী ছোকরার পরিচয় পাই। ছোকরাটির নাম নীলকান্ত। নীলকান্ত মাতৃহীন। এই মাতৃহীন বালকের অভিশপ্ত জীবনের নিঃশব্দ বেদনাকে রূপ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সতীশের দোয়াত চুরির অপবাদ নিয়ে

নিষ্কলঙ্ক নীলকান্ত সকলের অজ্ঞাতসারে যেখানে গৃহত্যাগ ক'রে চ'লে গেল, সেখানে তার গ্রাম্য পোষা-কুকুরটির সঙ্গে পাঠকের হৃদয়ও কি বেদনায় কেঁদে ওঠে না? গল্পের সমাপ্তি ঘটলেও আমাদের চিত্তপট থেকে ঝাঁকড়া-চুলওয়ালা, সুকণ্ঠ নীলকান্তের ম্লানমূর্ত্তি কিছুতেই মুছতে চায় না।

নীলকান্তকে বিস্মৃত হওয়া আমাদের পক্ষে যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব রহমৎ কাবুলিয়ালাকে স্মৃতিপট থেকে মুছে ফেলা। মানুষকে ছোরা মারতে হাত যার কাঁপেনা, তার মধ্যেও স্নেহপ্রবণ পিতৃহৃদয়ের এ কি করুণ-কোমলতা! তার পর্ব্বত-গৃহবাসিনী কন্যার স্মরণ-চিহ্নটুকুকে কত যত্নে সে বুকের কাছে রেখে দিয়েছে! তারই মুখখানিকে স্মরণ ক'রে সে মিনির জন্য নিয়ে আসে কিসমিস আর বাদাম। গল্প শেষ হ'য়ে গেলেও কানের কাছে কাবুলিওয়ালার কণ্ঠস্বর বাজতে থাকে, 'খোঁখী, তোমি সসুর বারি যাবিস?' রবীন্দ্র-সাহিত্য যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র আজ সমাদর লাভ ক'রেছে, সে হচ্ছে তাঁর কল্পনার এই ঔদার্য্যের জন্য। যারা অতিসাধারণ, তাদের মধ্যেও সৌন্দর্য্যকে আবিষ্কার করার মত দৃষ্টি আছে যাঁদের—তাঁরাই শুধু পারেন উঁচুদরের সাহিত্য সৃষ্টি করতে। রবীন্দ্রনাথের চোখে এই দৃষ্টি এবং এই জন্যই সাহিত্যে রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর যুড়ি মেলা কঠিন। কাবুলিওয়ালাকে সৃষ্টি ক'রে রবীন্দ্রনাথ বাঙলা-সাহিত্যে গণতন্ত্রের যে নূতন সুর জাগিয়েছেন, সেই সুরেরই সাধনা করেছেন শরৎচন্দ্র। শরৎ-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য তার গণতান্ত্রিকতায়। অতি কাছের

যারা, তাদেরই নিকটে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন তাঁর শ্রদ্ধার এবং প্রীতির অর্ঘ্য—সাহিত্যকে আশ্রয় ক'রে।

নীলকান্তের এবং রহমৎ কাবুলিওয়ালার সঙ্গে আর একটি মানুষকেও আমরা যেন স্মরণ করি। এই মানুষটি পুরুষ নয়, নারী। নারীটির নাম চন্দরা। চন্দরা ছিদামের স্ত্রী—নূতন-তৈরী নৌকার মত বেশ ছোট এবং সুডোল। বড় বৌকে হত্যা করার দায়িত্বের বোঝা স্বামী যখন তার স্কন্ধে চাপিয়ে দিলো, সে অস্বীকার করলো না। ফাঁসিকে স্থির জেনেও সে খুনের দায়িত্বকে স্বীকার ক'রে নিলো। সতেরো আঠারো বছরের এই গ্রাম্য তরুণীর চিত্তের দৃঢ়তা আমাদের অবাক করে দেয় বিস্ময়ে। সমস্ত পরিচিত লোকের চোখের উপর দিয়ে কলঙ্কিনী চন্দরা বন্দিনীর বেশে যেখানে চিরকালের মত গ্রাম ছেড়ে চলেছে—সেখানে পাঠকের চক্ষু হতভাগিনীর জন্য সমবেদনায় সজল হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে নীলকান্ত, রহমৎ-কাবুলিওয়ালা এবং চন্দরার মত সাধারণ নর-নারীর ছবি আরও অনেক আছে। এই সব ছবির সঙ্গে পরিচিত হ'তে চান যাঁরা—তাঁদের অনুরোধ করি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে ভাল ক'রে অধ্যয়ন করতে। বাঙলা সাহিত্যের ললাটে গণতন্ত্রের জয়মাল্য পরিয়েছেন যিনি, এই গণতান্ত্রিক যুগে তাঁর সাহিত্যকে নূতন দৃষ্টি নিয়ে অধ্যয়ন করবার দিন এসেছে।

(৬)

'পলাতকা'য় কবির কল্পনাকে নাড়া দিয়েছে যারা, তাদের আসন দুনিয়ার দুর্ভাগাদের দলে। অনাদরের মধ্যে অবাঞ্ছিত শৈলবালার জীবন হয়েছে সুরু। একে একে তিনটী মেয়ের পরে চতুর্থ মেয়ে হ'য়ে সে যখন জন্মালো তার বাপের ঘরে, জনক-জননীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। তারা তো মেয়ে চায়নি সংসারে; চেয়েছিলো একটি পুত্ররত্নের আবির্ভাবকে। সে আশা যখন বিফল হোলো তখন বাপ-মায়ের সমস্ত আক্রোশ পড়লো অনাহূত কন্যাটীর উপরে। বিনাদোষের অপরাধে অপরাধিনী শৈলবালার লাঞ্ছনার অন্ত নেই। পদে পদে তার ক্রুটী! মা তাকে বলে 'সর্ব্বনাশী', 'পোড়ারমুখী'; বাপ তাকে করে শাসন। এমনই অভিশপ্ত তার কুমারী-জীবন!

শৈলবালার পরে আমাদের দৃষ্টিপথে কবি যাকে দাঁড় করিয়েছেন সে বাঙলার যৌথ পরিবারের অন্তঃপুরচারিণী একটী বধূ। রোগে দেহ তার জীর্ণ, মৃত্যু দাঁড়িয়েছে তার শিয়রে। পতি-গৃহে প্রথমে সে এসেছিল যেদিন—সেদিন ছিল সে নয় বছরের একটী ক্ষুদ্র বালিকা। তার পর একটি একটি ক'রে তার জীবনের সুদীর্ঘ বাইশ বৎসর কেটে গেল সংসারের একটানা কাজের মধ্য দিয়ে। দশের ইচ্ছা বোঝাই-করা বন্দিনীর অর্থ-হীন জীবন! ছিল না অবকাশ, ছিল না স্বাতন্ত্র্য, ছিল না

আনন্দ। সেখানে শুধু রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধা—এই ছিল তার কাজ। ঋতুর পর ঋতু আসতো কেবল পঞ্জিকার পাতে; বসন্তের পর বসন্ত কোথা দিয়ে যে চলে যেত—বধ্ জানতে পারতো না তার কিছুই। তার পর এল দুরন্ত ব্যাধি; কবিরাজী, মুষ্টিযোগ—অনেক রকমের চিকিৎসার অত্যাচার হোলো সুরু। চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে মৃত্যু আগিয়ে আসতে লাগলো ধীরে ধীরে। জীবন যাকে কেবলই বঞ্চিত ক'রে এসেছে আনন্দের প্রাচুর্য্য থেকে, মরণ তার কানে বহন ক'রে এনেছে মুক্তির কলধ্বনি। যে বাঁধন-ডোরে সংসারের একঘেয়ে কাজের চাকায় জীবন ছিল তার বাঁধা, সেই বাঁধন-ডোর কেটে দেবার জন্যই তো আসছে মৃত্যু! আসন্ন মুক্তির সম্ভাবনায় আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে মৃত্যু-পথযাত্রী নারী ব'লে উঠেছে,

মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী,
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারী!
দাও, খুলে দাও দ্বার!
ব্যর্থ বাইশ বছর হ'তে পার ক'রে দাও কালের পারাবার।

মৃত্যু নারীর কাছে কেবল যে মুক্তির দূত হ'য়ে দেখা দিয়েছে তা নয়। তার আলোয় সে দেখতে পেয়েছে আপনার জ্যোতির্ম্ময় রূপ। সংসারের অসংখ্য কাজ জগদ্দল-শিলার মতো চেপে নেই আর জীবনে; শ্বশুর নেই, শাশুড়ী নেই, দেবর নেই, ভাসুর নেই, চাকর-বাকরের কলরব নেই, চোখ নামিয়ে, ঘোমটা টেনে অবগুণ্ঠিত ক্লান্ত জীবনকে টেনে টেনে চলবার বিড়ম্বনা নেই;

ভাঁড়ার ঘরের দেওয়াল মিলিয়ে গেছে নীলাভ দিগন্তের অসীমে ; দশের হুকুম পৌঁছায় না যেখানে—সেখানে যাওয়ার ডাক এসেছে এতদিন পরে। এই নিঃসীম মুক্তির মধ্যে বসন্তের রূপ সর্ব্বপ্রথম জাগলো তার চোখে। বনের আঙিনায় যে এসেছে বারে বারে, এতদিন পরে সে এসে দাঁড়ালো তার মনের আঙিনায়। বিহ্বল ফাল্গুন মর্ম্মে দিলো তার দোল, রক্তে জাগালো তার সুরের তরঙ্গ। আনন্দের এই অভূতপূর্ব্ব অনুভূতির মধ্যে নারী হঠাৎ আবিষ্কার করল, অন্তঃপুরচারিণী শৃঙ্খলিতা বধূর মধ্যে তার যে রূপটী প্রকাশ পেয়েছে—সে হোলো তার খণ্ডিত বিকৃত রূপ। তার সত্যিকারের মিল হ'চ্ছে চাঁদের সঙ্গে, ফুলের সঙ্গে, তারার সঙ্গে। একটী মূল সুরের যে অন্তঃসলিল প্রবাহ চলেছে ফুলের আর চাঁদের আর নক্ষত্রের মর্ম্মতলে, নারীর মর্ম্মতলেও সেই একই প্রবাহ। আপনার গভীরতর জীবন-ধারার গৌরবময় অস্তিত্বের সঙ্গে সদ্যপরিচিতা বধূর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হ'য়েছে,

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
জান্‌লা দিয়ে চেয়ে আকাশ পানে
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে প্রাণে—
আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেচে জ্যোৎস্না-বীণায়
নিদ্রাবিহীন শশী।

আমি নইলে মিথ্যা হ'ত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হ'ত কাননে ফুল ফোটা।

এর পরেই যে মেয়েটী তার রুগ্নদেহ নিয়ে আমাদের ছল-ছল নয়নের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে সে বিন্নু। বয়স তার মাত্র তেইশ। এই অল্প বয়সেই রোগে ধরলে তাকে। বছর দেড়েক চিকিৎসার পর ডাক্তারের পরামর্শে স্বামী তাকে নিয়ে চলেছে হাওয়া বদল করতে। নিবিড় ঘন পরিবারের মধ্যে যেখানে শ্বশুর ভাসুর সামনে পিছে, ডাইনে বাঁয়ে, সেখানে আড়ালে আবডালে স্বামীর সঙ্গে বিন্নুর মিলন ছিল অসম্পূর্ণ। চেঞ্জে যাওয়ার পথে বিন্নু যখন প্রথম পেল তার স্বামীকে একান্ত আপনার ক'রে, তার রোগা মুখের মস্ত বড়ো দুটী চোখে ফুটে উঠলো আনন্দের জ্যোতি। পাঠক-পাঠিকা সেই আনন্দোদ্ভাসিত মুখখানির ছবি কিছুতেই ভুলতে পারে না। তারপরে বিলাসপুর ষ্টেশনে দেখি, কুলি-নারী রুক্মিনীর দুঃখ দূর করবার জন্য বিন্নু পঁচিশ টাকা দিতে অনুরোধ করছে তার স্বামীকে। পথে যেতে যেতে কী তার আনন্দ! প্রত্যেকটী দৃশ্য অনির্ব্বচনীয় মহিমা নিয়ে তার সামনে দেখা দিয়েছে। কিন্তু হায়! চেঞ্জ থেকে বিন্নু আর ফিরে এল না। বিন্নুর কাহিনীর উপরে কবি যেখানে সমাপ্তির রেখা টেনেছেন, সেখানে নয়নের অশ্রুজলকে কিছুতেই আমরা চেপে রাখতে পারিনে। এমন এক সুন্দর জীবন পারিবারিক কর্ত্তব্যের অন্ধকূপের মধ্যে অকালে শুকিয়ে গেল! জীবন তার কাছে অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের আর আনন্দের ডালি নিয়ে যখন উপস্থিত হয়েছে, তখন

বিনুর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। বিলাসপুর ষ্টেশনে যাত্রীশালার দুয়ার খুলে বিনু যেখানে স্বামীকে বলছে,

"দেখ, দেখ, এক্কাগাড়ি কেমন চলে !
আর দেখেচ বাছুরটিরে ঐ, আ ম'রে যাই, চিকণ নধর দেহ,
মায়ের চোখে কী সুগভীর স্নেহ !
ঐ যেখানে দিঘির উঁচু পাড়ি,
সিসুগাছের তলাটিতে পাঁচির-ঘেরা ছোট্টবাড়ি
ঐ যে রেলের কাছে,—
ইষ্টেশনের বাবু থাকে ?—আহা ওরা কেমন সুখে আছে।"

—আমাদের মন তরুণীর জীবনের ব্যর্থতার কথা ভেবে সমবেদনায় হায় হায় ক'রে ওঠে ! জীবনের পথে এই যে সহজ আনন্দগুলি ছড়িয়ে রয়েছে—বনের কিনারায় চাঁদ দেখার আনন্দ, পশ্চিম আকাশে সান্ধ্যমেঘের বর্ণচ্ছটা দেখার সুখ, বৃহত্তর জগতের জীবন-প্রবাহের সঙ্গে ভেসে যাওয়ার পুলক,—এই সহজ আনন্দগুলি থেকে বিনুর জীবনকে এতকাল বঞ্চিত রাখবার কি অধিকার ছিল তার শ্বশুরবাড়ীর অভিভাবক আর অভিভাবিকাদের ? আবিসিনিয়ার দুঃখে আমরা অশ্রুমোচন করি, ইটালির ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানাই, সাইমন কমিশনের সম্মুখে আমরা কালো-পতাকা উড়াই, 'সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস হোক' ব'লে আকাশে আকাশে আমরা হুঙ্কার তুলি,—কিন্তু আমাদের পারিবারিক জীবনের আন্দামানের দুর্ভেদ্য জেলখানাগুলিতে সহস্র সহস্র মেয়ের জীবনকে আমরা যে পঙ্গু ক'রে দিচ্ছি—এই অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তো

এখনও প্রবল হ'য়ে ওঠে নি! বিনু তো একজন নয়; হাজার হাজার বিনুকে আমরা কর্ত্তব্যের বুলি কপচিয়ে ক্রীতদাসী ক'রে রেখেছি পর্দ্দার আড়ালে।

বিনুর অস্তিত্বের উপরে যেখানে যবনিকাপাত হয়েছে—সেখানে কবির কল্পজগতে জন্ম নিয়ে আর একটী নারী দেখা দিয়েছে পলাতকার মধ্যে। এই মেয়েটীর নাম মঞ্জুলিকা। শৈলবালা কুমারী, বিনু পরিণীতা—মঞ্জুলিকা কিন্তু বিধবা। মঞ্জুলী যখন কচিমেয়ে তখনই তার বাপ পঞ্চাননের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন। পঞ্চাননের বয়স মঞ্জুলীর চেয়ে পাঁচগুণ বেশী। মঞ্জুলীর মা আপত্তি জানালেন অনেক, কিন্তু প্রতিবাদ টিকলো না। বিয়ের অল্পদিন পরেই পঞ্চানন মারা গেল। মঞ্জুলিকা সিঁদুর মুছে বাপের ঘরে ফিরে এল। দুঃখে সুখে বালবিধবার দিন কাটতে লাগলো। অবশেষে বালিকার বয়স ষোলয় গিয়ে পৌঁছাল। তরুণীর শূন্য হৃদয়কে জুড়ে বসলো তার ছেলেবেলার খেলাঘরের সাথী পুলিন। মা বুঝতে পারলেন মেয়ের মনের গোপন ভালোবাসার কথা। মঞ্জুলিকার বাবাকে অনেক ক'রে তিনি বুঝালেন মেয়ের আবার বিয়ে দেবার জন্য। কিছুতেই কিছু হোলো না। অবশেষে মঞ্জুলিকাকে কাঁদিয়ে মায়ের একদিন মৃত্যু হোলো। বাপের সেবার ভার পড়লো মেয়ের উপরে। মঞ্জুলিকা প্রাণপণে পিতার পরিচর্য্যা করে। মায়ের মৃত্যুর পর এগারো মাস কেটে গেছে। ইতিমধ্যে গুজব শোনা গেল, বাড়ীতে ঘটকের আনাগোনা সুরু হয়েছে। সংসারে মায়ের আসন আর একজন এসে দখল করবে—এই কথা ভেবে

মঞ্জুলিকার প্রাণ ভেঙে পড়ল। গুজব অবশেষে সত্যে পরিণত হ'ল। বাবা বিয়ে করতে চলে গেলেন বাখরগঞ্জে। বৌকে নিয়ে ফিরে এসে দেখলেন, মঞ্জুলিকা ঘরে নেই। পুলিন তাকে বিয়ে ক'রে ফরাক্কাবাদ চলে গেছে। সন্তানের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হ'য়ে বাপ অভিশাপ দিলেন বটে, কিন্তু মঞ্জুলিকার দাম্পত্য-জীবনের মাধুর্য্যের ছবি কল্পনা ক'রে পাঠক-পাঠিকার চিত্ত আনন্দের আতিশয্যে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে।

মঞ্জুলিকাকে পুলিন ডাক্তারের সঙ্গে ফরাক্কাবাদে পাঠিয়ে দিয়ে কবি যাকে আমাদের দৃষ্টির সামনে উপস্থিত করেছেন সে হ'ল কালোমেয়ে নন্দরাণী। তার বিয়ের জন্য ভেবে ভেবে বাপের মনে দুশ্চিন্তার অবধি নেই। নন্দরাণী বুঝতে পারে— রং তার কালো ব'লে কি রকম একটা উদ্বেগের সঞ্চার করেছে সে গৃহের মধ্যে। একটী ভাঙা জান্‌লার মরচে-পড়া গরাদে ধ'রে নন্দরাণী একা একা বসে থাকে আকাশের দিকে তাকিয়ে। বাতাস তার চুল নিয়ে করে খেলা। নন্দরাণী একা ব'সে ব'সে কি ভাবে? কালো মেয়েটীর ছবির সঙ্গে আর একজনের ছবি আমাদের মনের সম্মুখে ধরেছেন কবি। নন্দরাণীদের বাড়ীর সামনে 'মেস'এ থাকে সে। বেকার যুবক—দারিদ্র্যের দুশ্চিন্তায় চাকরীর সন্ধানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। তার সঙ্গী একটী বাঁশী আর বাঁশীর সুরের মধ্যে তার চিত্ত পায় দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি।

কালো-মেয়ে নন্দরাণীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর কবি আর একটী মানুষকে আমাদের চোখের সামনে ধ'রেছেন।

এই মানুষটি হোলো পাগল মহেশ। মহেশ তার খোঁড়া কুকুর ভূতো আর কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ে স্থস্মিকে নিয়ে এমন এক সংসার পাতিয়েছে যার আড়ম্বরহীন সরল মাধুর্য্য আমাদের মনকে মুগ্ধ করে।

পলাতকার কবিতাগুলি প'ড়ে আমাদের মনে যাদের ছবি থেকে যায় চিরদিনের জন্য—সেই শৈলবালা আর নন্দরাণী, বিনু আর মঞ্জুলিকা, ভোলা আর মহেশ আমাদের আশে পাশে হাজারে হাজারে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে। আমাদের দৃষ্টি নেই, তাইতো তারা আমাদের কাছে চির-উপেক্ষিত হয়ে আছে। চামড়ার চোখ দিয়ে দেখি, সমস্ত চৈতন্য দিয়ে তো দেখি না। মঞ্জুলিকার বেদনা তাই আমাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যায়, মহেশকে পাগল ব'লে উপেক্ষা করি, কর্ম্মের নেশায় বিভোর হ'য়ে 'মনু'র চিঠি না পড়েই ছিঁড়ে ফেলি, 'ভোলা' কাছে এলে বিরক্ত হ'য়ে উঠি, অন্তঃপুর-চারিণী বধূর মৌন ক্রন্দনের প্রতি উদাসীন থাকি। আমাদের বাহিরের দুটী চর্ম্মচক্ষু ছাড়া আরও একটী চোখ আছে। এই চোখটী হোলো আমাদের ভিতরের চোখ। বাহিরের চোখে যাকে আমরা দেখেও দেখি না, অন্তরের চোখে সে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় নূতনরূপ নিয়ে। এই চোখ নিয়েই টলষ্টয় দেখেছিলেন ম্যাস্লোভাকে, ডস্টয়েভস্কি দেখেছিলেন সোনিয়াকে, হুগো দেখেছিলেন কসেটকে আর জিন ভ্যালজিনকে, হার্ডি দেখেছিলেন টেস্‌কে, খৃষ্ট দেখেছিলেন মেরী ম্যাগডেলেনকে। অন্তরের চোখ নিয়ে যখন তাকাই মানুষের দিকে, চোখ তার কাছ থেকে ফেরাতে

ইচ্ছা করে না। যে ছিল সুদূরের, সে হয়ে যায় আত্মীয়ের চাইতেও আত্মীয়, পর হয়ে যায় ভাই, সকলের কাছে যে উপেক্ষিত সে এসে জুড়ে বসে হৃদয়ের আসন। পৃথিবীর সব কিছুই আমাদের কাছে বিপুল মহিমার মধ্যে এক নিমেষে জেগে উঠবে যদি দেখার মত ক'রে সব কিছুকে দেখতে পারি। মেটার্লিঙ্কের মধ্যে সেদিন পড়ছিলাম, But we must accustom ourselves to live like an angel who has just sprung to life, like a woman who loves, or a man on the point of death. পৃথিবী থেকে চিরবিদায়ের আগে মুমূর্ষু মানুষ যে দৃষ্টি নিয়ে নিরীক্ষণ করে এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুকে—নারী যখন প্রথম ভালোবাসে কোন পুরুষকে, যে চোখ দিয়ে সে অবলোকন করে তার প্রিয়তমের মুখচ্ছবিকে—সেই দৃষ্টি নিয়ে কবিরা যুগে যুগে দেখে এসেছে মানুষকে, প্রকৃতিকে, সংসারের সমস্ত কিছু ঘটনাকে। তাই তো তারা কোন কিছুকে ছোট ব'লে অবহেলা করতে পারেনি, সব কিছুর মধ্যে দেখেছে এমন একটা অপার্থিব সৌন্দর্য্য যাকে কোন কিছুই করতে পারে না ম্লান। সমস্ত মানুষের মধ্যে সেই অদৃশ্য মাধুর্য্যকে যখন উপলব্ধি করি, তখন সবাইকে না ভালোবেসে আর উপায় থাকে না। To learn to love one must learn to see. সেই সৌন্দর্য্য দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ কালো মেয়ে নন্দরাণীর মধ্যে আর সেই উপলব্ধির গভীরতা থেকে লিখেছেন তিনি—

আমি যে ওর হৃদয়খানি স্পষ্ট দেখি আঁকা ;—
ও যেন যুঁই ফুলের বাগান সন্ধ্যা-ছায়ায় ঢাকা ;
একটুখানি চাঁদের রেখা কৃষ্ণপক্ষে স্তব্ধ নিশীথরাতে
কালো জলের গহন কিনারাতে।

যে মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে নন্দরাণীর দিকে চেয়েছেন কবি, সেই দৃষ্টি নিয়েই অচেনা বালক ভোলার মধ্যে তিনি দেখলেন এই ভুবনের চিরকালের দুরন্ত ভোলাকে। 'আমি ভোলা'—শুধু এইমাত্র পরিচয় দিয়ে অপরিচিত বালক যখন তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়ালো—তিনি তাকে দু'হাত দিয়ে বক্ষে চেপে বললেন,—

ওরে ওরে বুঝে নিলেম আজ
ফুরোয়নি মোর কাজ !
আমার রাজা, আমার সখা, আমার বাছা আজো
কত সাজেই সাজো !
নতুন হয়ে আমার বুকে এলে,
চিরদিনের সহজ পথটী আপনি খুঁজে পেলে !

ঠিক এই দৃষ্টির বলেই কবি পাগল মহেশের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন এমন একটা অসীম সৌন্দর্য্য যা অন্যত্র দুর্লভ।

তারার মত আপন আলো নিয়ে বুকের তলে—
যে মানুষ যুগ হ'তে যুগান্তরে চলে,
প্রাণখানি যাঁর বাঁশির মতো সীমাহীনের হাতে
সরল সুরে বাজে দিনেরাতে,

যাঁর চরণের স্পর্শে
ধূলায় ধূলায় বসুন্ধরা উঠলো কেঁপে হর্ষে—
আমি যেন দেখতে পেতেম তারে
দীনের বাসায়, এই পাগলের ভাঙাঘরের দ্বারে।

এই যে দুর্লভ দৃষ্টি—যার কাছে ছোট আর ঘৃণ্য ব'লে নেই কিছু পৃথিবীতে, যার সামনে জগতের সব কিছু ফুটে ওঠে অপার্থিব মহিমা নিয়ে—এই দৃষ্টির পরিচয় পাই পলাতকায় আর সেই জন্যই পলাতকার আকর্ষণ আমাদের কাছে এত গভীর।
